যখন কিডন্যাপার (উপন্যাস)

অদ্রীশ বর্ধন

সূচীপত্র

Recommended eBook Reader

◆ Android ◆

Lithum

◆ Desktop ◆

Calibre

◆ Apple ◆

iBooks

০১. ডিভোর্সি ললনা কল্পনা চিটনিস

ডিভোর্সি ললনা কল্পনা চিটনিস

আমি ইন্দ্রনাথ রুদ্র, লিখে যাচ্ছি আমার এই কাহিনি, নিজের কলমে। বড় গোপন কাহিনি যে। মৃগাঙ্ককে দিয়ে লেখালে সে তাতে জল মেশাবে অথবা কল্পনার রং মেশাবে। তার ওপর আছে কবিতা বউদির টিটকিরি। সে আর এক জ্বালা।

পুরুষ মানুষ যে ভীষ্ম হয়ে থাকতে পারে, সহজ এই ব্যাপারটা আমার এই অন্তর-টিপুনি দেওয়া বউদিটি কিছুতেই বুঝতে চায় না। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা রাখতে হয় বইকি। নইলে কি সমাজের মধ্যে থাকা যায়? মেয়েরা আছে বলেই আমরা এই পুরুষরা টিকে আছি। নইলে কোনকালে ফৌত হয়ে যেতাম। তবে হ্যাঁ, একটু গা বাঁচিয়ে চলতে হয়। সেটা একটা আর্ট। ঈশ্বরের কৃপায়, আমি সে আর্টে আর্টিস্ট।

কল্পনা চিটনিস গ্যাংটকের মেয়ে। মানুষ হয়েছে ব্যাঙ্গালোরে। বিয়ে করেছিল কলকাতার রবি রে-কে। ওদের একটা ছেলেও হয়েছিল। ছেলেটার নাম সোমনাথ। তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সোমনাথের বয়স এখন দশ।

কল্পনা সিকিম-গ্যাংটক-ব্যাঙ্গালোর-কলকাতা-গুজরাতের কালচারে মিশ খাওয়া এক আশ্চর্য কন্যা। তার সবুজ পাথরের মতো আশ্চর্য চোখে যখন তখন সবুজ বিদ্যুৎ নেচে নেচে যায়। ঝকঝকে মুক্তোর মতো সারি সারি দাঁতে ফুটফুটে বোদ্দর যখন তখন ঝলসে ওঠে। কথায় শোনা যায় জলতরঙ্গ, দেহতরঙ্গে মণিপুরী নৃত্য। বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বড় পোক্ত এই কল্পনা। একটা জীবন্ত প্রহেলিকা।

সে আমাকে ভালবাসে। আমি মনে মনে তা বুঝি। কিন্তু আমি তাকে সেহ করি, আমার ছোট বোনের মতো। সে জানে, আমি ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই সীমার

বাইরে কখনও পা দেয় না। ফলে, আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কটা বড় মধুর–সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর।

কল্পনা আমার কাছে একদিন একটা প্রবলেম নিয়ে এসেছিল। আমি নাকি প্রবলেম-শুটার ওর চোখে। আমার কাছে আমি একটা ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

সে যাক। কল্পনা এসে বললে, দাদা, ঘর তো ভাঙল। এখন ছেলেটাকে তো বড় করতে হবে।

আমি হুশিয়ার হয়ে গেলাম। বললাম, তা তো বটে। তা তো বটে! কল্পনা নিশ্চয় থট-রিডার। মন-পঠন বিদ্যায় পোক্ত। সব মেয়েরাই তাই হয়। আমার মতে, ওদের অগোচর কিছু থাকে না। যষ্ঠ ইন্দ্রিয় শুধু ওদেরই আছে।

মুক্তো দাঁতে কাঞ্চনজঙ্ঘার কিরীট একটু দেখিয়ে আর হাসিতে অল্প কিরণ ছড়িয়ে কল্পনা বলেছিল, পাহাড়ি জায়গায় থাকতে হবে। ছেলেকে নিয়ে একলা থাকা যায়?

হুঁশিয়ার হয়ে গেলাম। বললাম, পাহাড়ি মেয়ে তুমি, পাহাড়ে থাকতে ভয় কিসের?

ও বললে, তা নয়, ইন্দ্রদা। এমনই একটা কাজ নিয়েছি, যে কাজে হামেশাই ঘরের বাইরে থাকতে হবে। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরার কাজ। বাড়িতে সোমনাথ একলা থাকবে কী করে? একা রেখে যাওয়াটা কি সমীচীন?

দেবকন্যা স্টাইলে এমনই ললিত ভঙ্গিমায় প্রস্তাবনাটা উপস্থাপন করেছিল কল্পনা যে, আমি কানাগলিতে আটকে গেছিলাম। স্মার্টলি বলেছিলাম, কী করাতে হবে?

আমার সঙ্গে থাকতে হবে। আলাদা ফ্ল্যাটে। কাছাকাছি দু'টো ফ্ল্যাটে।

ভাইবোনের মতো—ওর চোখের তারায় আমার ছায়া দেখতে দেখতে আমি সাত পাকে বাঁধা না থাকার আভাস দিয়ে গেছিলাম।

মধুর হেসে ও বলেছিল, আপনি বড় ভীতু। তাই হবে।

হ্যাঁ, আমি ভীতু। তাই হোক।

এই হল সূচনা। এই কাহিনির আগের কাহিনি। এবার আসা যাক আসল কাহিনিতে।

তারপর আমাদের এক অঞ্চলে থাকা শুরু হয়েছিল এমন একটা জায়গায়, যার পাশেই একটা গভীর খাদ।

ঘটনার শুরু যে সময়টা থেকে, সেই সময়টায় বড্ড বেশি শব্দহীন হয়েছিল অত গভীর খাদটা। শিকারি পাখি-টাখি ছিল না একটাও। অন্য সময়ে মাথার ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে যায় বাতাসে গা এলিয়ে দিয়ে—সেদিন কোনও আকাশচারীকে দেখতে পাইনি। বুনন কুকুরের মতো দেখতে নেকড়েগুলোর গান-টান শোনা যাচ্ছিল না। দরজার সামনের তালঢ্যাঙা পাইন গাছে যে পাচাটা থাকে, সেই মহাশয়ও আমার নাম-টাম জিজ্ঞেস করেনি। আমার চাইতে চৌকস যে কোনও মানুষ এই সবই যে আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস, তা আঁচ করে ফেলত নিশ্চয়। কিন্তু আমার ব্রেনে সেই সিগন্যাল আসেনি।

কনকনে ঠাণ্ডাটা বড় ভাল লাগছিল বলেই কুঁদ হয়েছিলাম। বহু নিচের গ্যাংটকের দিকে চোখের পাতা না ফেলে তাকিয়েছিলাম। হিমালয়ের মহান সৌন্দর্য এমনই একটা আবেশ রচনা করে গেছিল মনের মধ্যে যে, এই নৈঃশব্দ্য যে, আগুয়ান ডেঞ্জারের রেড সিগন্যাল, তা বুঝতে পারিনি। অথচ আমার বোঝা উচিত ছিল। আত্মহারা হয়ে যাওয়াটা আমার ধাতে নেই। সেদিন তা হয়েছিলাম। কাজটা ভাল করিনি।

হেঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, খতম হল ক'জন?

পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছিল দুমদাম ঘুষোঘুষির আওয়াজ আর গাঁক-গাক চেঁচানির মতো গলাবাজি। সোমনাথের গলা ভেসে এল সব আওয়াজ ছাপিয়ে, কী?

তোর হিরোইন জানে মারল ক'জনকে?

কথাটা যার দিকে ছুঁড়ে দিলাম, সে রয়েছে আমার কাছ থেকে বিশ ফুট দূরে। আমি কিচেনে, সোমনাথ লিভিংরুমে। তাই চেঁচাতে হল ফুসফুস ফাটিয়ে। ওকেও কথা বলতে হচ্ছে চিল-চিৎকার করে। এইভাবেই চলছে পাঁচদিন ধরে। কেন না,

সোমনাথের মা সোমনাথকে সামলানোর ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। মামা। সামলাক ভাগ্নেকে। এর মধ্যে রঙ্গ কিসসু নেই। কিন্তু কঙ্গো ড্যান্সে পোক্ত এই ভাগ্নেকে সামাল দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা।

আমি অবশ্য জীবনের এই নতুন অধ্যায়ের নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের দিকে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছি। গোয়েন্দাগিরি করে করে এত হেদিয়ে গেছি যে, লোকালয় থেকে কিছুদিন দূরে থাকতে পারলে বাঁচি।

লম্বা লম্বা পা ফেলে গিয়ে দাঁড়ালাম লিভিংরুমের সামনে। বললাম, তোর ওই যন্তরে ভলুম কন্ট্রোল নেই?

সোমনাথ তখন যে বস্তুটা নিয়ে তন্ময় হয়ে রয়েছে, তার নাম গেমস ফ্রীক। এতই নিবিষ্ট যে আমার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সময়ও নেই। গেমস ফ্রীক এক হাতে, কন্ট্রোল নাড়ছে আর এক হাত দিয়ে। অ্যাকশন ফুটে ফুটে উঠছে বিল্ট-ইন কমপিউটার স্ক্রীনে। বস্তুটা ওকে দিয়েছি গতকাল। সেই থেকে এক নাগাড়ে খেলেই চলেছে। খেলুক। কিন্তু খুব যে একটা আমোদ পাচ্ছে, তা নয়। কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে আমারও।

খেলাটা এনে দিয়েছিলাম ওর খপ্পর থেকে একটু রেহাই পাওয়ার জন্যে। গুতিয়ে গুতিয়ে আমাকে নিয়ে যেত পাহাড়ি জায়গায়—মার্শাল আর্ট শেখবার মতলবে। আশ্চর্য এই মল্লশিল্প জানা থাকলে আখেরে কাজ দেয়। তাই ওকে কিছু কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছি। আবার সক্কালবেলা স্কুলেও নিয়ে গেছি, বিকেলবেলা স্কুল থেকে নিয়ে এসেছি। বাকি সময়টা সিকিমের রান্না বেঁধেছি। ব্রুস উইলির মুভি দেখেছি। মামা-ভাগ্নের অট্ট অট্ট হাসিতে ঘর প্রায় চৌচির হয়েছে। আর এখন গেছে আমার চোখের আড়ালে—যাতে আমি দেখতে না পাই। বিটকেল গেম যে ওকে খিটকে করে তুলেছে তা তো মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। বসলাম পাশের সোফায় বললাম, চল, এক চক্কর ঘুরে আসি।

প্রস্তাবটা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বের করে দিল বিচ্ছু সোমনাথ। আবার এলাম অন্য কথায়, আমার গপ্পো শুনবি? তোর মায়ের কথা?

আমার গাপ্পো মানে ডেঞ্জারাস মানুষদের সঙ্গে আমার কাজ কারবারের কথা। এই তো সেদিন, গরমের শেষের দিকে, কল্পনা আর সোমনাথকে খুনের ফিকিরে ছিল ভুটিয়া গুণ্ডা দোঙ্গা জং! মানুষ মেরে বড় উল্লাস পায় দোঙ্গা জং। একেবারে

পিশাচ। তার খপ্পর থেকে বাঁচবার জন্যেই নাকি আমার দ্বারস্থ হয়েছিল কল্পনা। কি করে ফেরাই? জানি ও আমাকে মনে মনে ভালবাসে। ডিভোর্সের আগে থেকেই ওর মনে রং ধরিয়ে ফেলেছি আমার অজান্তে। সোমনাথের বয়স যখন মাত্র ছ'বছর, তখনই আর পুরোনো বর নিয়ে ঘর করতে পারেনি কল্পনা। এই হিমালয় অঞ্চলেই দ্রৌপদী নামে একটা গোত্র আছে। বাড়ির এক বউ সব ক'টা ভাইকে বিয়েও করতে পারে। তিব্বতী আর নেপালি মেয়েরা তো এ ব্যাপারে অনেক আগুয়ান। রাখঢাক রাখে না সোয়ামি বদল করা বা একাধিক গোপন অথবা প্রকাশ্য সোয়ামি রাখার ব্যাপারে। কল্পনা চিটনিসের রক্তে রয়েছে সেই টান। ফলে, ছ'বছরের ছেলেকে নিয়ে ছেড়েছে এক স্বামীকে। খুনে গুণ্ডা পিছনে লেগেছে সেই থেকে। রঙ্গমঞ্চে আমার আবির্ভাব তারপরেই। ঠেঙারে ঠেকাতে। কিন্তু মালাবদলের ব্যাপারে আমি নেই। আমি যে ভীষ্ম। নির্ভেজাল। ব্যাসদেব নই। এই ভদ্রলোকের 'সৎকর্ম', মায়ের হুকুমে, কারও অজানা নয়। সুতরাং সেই পুণ্য প্রসঙ্গ থেকে বিরত রইলাম।

ট্যাঁটা সোমনাথ মা'কে নিয়েও কথা বলতে চাইল না আমার সঙ্গে। কথা ঘুবিয়ে দিল অন্যদিকে—ওই দ্যাখো, মামা। নষ্টরানি খেপেছে।

নষ্টরানি যাকে বলছে সে একটা কালিকা টাইপের মেয়েছেলে। যেমন কালো, তেমনি মারকুটে। এলো চুল পাকিয়ে পাকিয়ে বহু বল্লমের মতো ঝুলিয়ে রেখেছে পিঠে। ভীষণাকৃষ্ণা করাল রূপে একাই লড়ে যাচ্ছে তিন-তিনজন পেশিপুষ্ট জোয়ানের সঙ্গে। আশপাশে কাঁটা ঝোপ, দূরে দূরে খোঁচা খোঁচা পাহাড়। রুদ্রাণীর গলা চিরে যে হিস-হিস লড়াই-চিকার ঠিকরে আসছে, তা ইলেকট্রনিক হুঙ্কার… কিন্তু গায়ের রক্ত জল করে দেয়।

আমি বলেছিলাম, শয়তানের কারখানায় তৈরি মেয়েছেলে মনে হচ্ছে।

সোমনাথ বললে, বদলা নিচ্ছে রানি। ওর বোনকে যে বেচে দিয়েছে বদমাস মেয়ে-কারবারিরা।

বাচ্চাদের ইলেকট্রনিক খেলার মধ্যেও মেয়েপাচারের গল্প। গোল্লায় গেল দেশটা। আমার চোখের সামনেই করালী কন্যার ছুরির কোপে তিন দুশমনের রক্ত ছিটিয়ে গেল কমপিউটার স্ক্রীনে। বীভৎস।

কন্ট্রোলের স্টপ বোতাম টিপে-দিলাম। বন্ধ হল নারকীয় খেলা। বললাম, সোমনাথ, তুই আর তার মা বিপদের মধ্যে আছিস। কিন্তু আমি তো আছি।

তুমি তো আগলে রেখেছ—আমাকে আর মাকে।

আমার চোখে চোখে চেয়ে চেয়ে বলে গেল দশ বছরের সোমনাথ। সরল চাহনি। কিন্তু কথাটা বক্র। বহু রকমের অর্থবহ। যার ঔরসে জন্ম, মা তাকে ভালবাসে না। বাসে আমাকে। সোমনাথের তা অজানা নয়। ছোটরা বোঝে অনেক। ওদের মনের তল খুঁজে পায় ক'জন?

মনের ভেতরকার মোচড়টাকে বাইরে টেনে না এনে হাসিমুখে বললাম, মা তো ক'দিন পরেই ফিরবে। চ, খাবি চ।

খেলাটা শেষ করে নিই। নষ্টরানি কি মার মারছে, মামা।

দ্যাখ।

চলে এলাম কিচেন রুমে। শুনে গেলাম নষ্টরানির চিল-চিৎকার। বেধড়ক পিঠছে। রসিয়ে রসিয়ে রণরঙ্গিনী সেই মূর্তি দেখছে সোমনাথ। নিশ্চয় মা'কে কল্পনা করে নিচ্ছে সেই জায়গায়। দুশমন সংহার করছে মা।

মিনিট তিনেক পরেই মোবাইলে ভেসে এল কল্পনার কণ্ঠস্বর। কাজের মধ্যে একটু ফুরসৎ পেয়েই ছেলের খোঁজ নিচ্ছে। সামলাতে পারছি তো দামাল ভাগ্নেকে?

কল্পনা কাজ করে লোকাল টেলিভিশন স্টেশনে। নিউজ কমেন্টেটর। এখানে সেখানে গিয়ে চালু ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে খবর বলে যায় মুখে মুখে। আইন পড়া আছে। পড়েছে ব্যাঙ্গালোরে। আমার সঙ্গে ওর আলাপ সেইখানেই। ডিভোর্সের আগে একটা কুটিল কেসের কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গিয়ে।

ছেলের খবর নিয়ে আর আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছেটা মিটিয়ে নিয়ে লাইন ডিসকানেক্ট করে দিল কল্পনা।

গেলাম লিভিংরুমে, সোমনাথকে, খবরটা দেওয়ার জন্যে। কিন্তু ঘর ফাকা। বাড়ির বাইরে গেলাম। এখানকার পাইন গাছের তলায় খেলতে ভালবাসে

সোমনাথ। কিন্তু কেউ নেই সেখানে। মুখ হাঁ করে রয়েছে পাশের গিরিখাদ। হাঁক দিলাম গলা চড়িয়ে, সোমনাথ?

জবাব দিল না সোমনাথ।

মা টেলিফোন করেছিল। কাজ শেষ। এবার আসছে।

সোমনাথ নিশ্চুপ।

বাড়ির এ পাশ ও পাশ দেখে নিয়ে ফিরে গেলাম ভেতরে। গেস্ট রুমে উকি মারলাম। কেউ নেই। বাথরুমেও কেউ নেই। ফের গেলাম রাস্তায়। এ রাস্তায় গাড়ি আসে কম। পাশেই তো খাদ।

সোমনাথ! মা ফোন করেছিল। বাড়ি ফিরছে।

মায়ের ভয় দেখালাম। ছেলে কিন্তু অভিমানী। জবাব দিল না।

গঞ্জালো নামে এক বিদেশি ভদ্রলোক থাকেন পাশের বাড়িতে। এই দেশটাই এখন তার স্বদেশ। মাতৃভূমির নাম মুখেও আনেন না। তাঁর দুই ছেলে সোমনাথের সমবয়সি। তাদের সঙ্গে খেলতে গেলে সোমনাথ আমাকে বলে যায়। একটু নিচের ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গেলেও আমাকে জানিয়ে যায়। খোলা রাস্তায় কদাচ যায়। খাদের ধারের সরু রাস্তার ওপর কল্পনার এই বাড়ি থেকেই খাদ দেখা যায়, তাই খাদের ধারেও ছেলেটা একা কখনও যায় না।

ফোন করলাম পাশের বাড়ির মিস্টার গঞ্জালোকে। সোমনাথ সেখানেও নেই। ঘড়ি দেখলাম। কল্পনা ফোন করেছিল চারটে বাইশে। এখন চারটে আটত্রিশ। এইটুকু সময়ের মধ্যে উবে গেল ছেলেটা। জানলা দিয়ে তাকালাম পাহাড়ের দিকে। কিন্তু পাহাড় তো ফাঁকা।

টেলিফোন এল মিস্টার গঞ্জালোর। তার ছেলেরাও দেখেনি সোমনাথকে। উনি নিজেই বেরোচ্ছেন খুঁজতে। প্রতিবেশী সজ্জন হলেই জগত সুন্দর। সুতরাং আমার চিন্তা কিসের?

চিন্তা কিন্তু কুটকুট কামড় বসিয়ে গেল মনের মধ্যে। একটু পরেই পাহাড় থেকে ফোন করে গঞ্জালো সাহেব জানালেন, সোমনাথ ওখানেও নেই।

এবার আমি নিজেই উঁকি দিলাম খাদের মধ্যে। কিনারা খুব গড়ানে নয়। তবু যদি গড়িয়ে গিয়ে যায়, এই চিন্তায় নরম মাটিতে পা বসিয়ে বসিয়ে নামতে নামতে হাঁক দিলাম আবার, সোমনাথ, কোথায় তুই?

ঢালু খাদের এদিকে সেদিকে ওয়ালনাট গাছ আছে অনেক। ঠিক যেন খাদের বাঁকা আঙুল। সোমনাথকে অনেকবার গল্পচ্ছলে বলেছিলাম, এইসব গাছের গায়ে একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে নিলে খাসা হতো। তাই আবার ডাক দিলাম– সোমনাথ! কোথায় তুই?

মনে হল যেন অনেক দূর থেকে একটা গলা ভেসে এল। পা ভেঙে পড়ে আছে হয়তো কোথাও।

সোমনাথ! সোমনাথ!

গাছের পাতার খসখস আওয়াজ ছাড়া কোনও শব্দ নেই। তারপরেই আবার গলাবাজি। যান্ত্রিক স্বর। এবার চিনলাম। গেমস ফ্রিক খেলার সেই কালিকারানি চেঁচিয়ে যাচ্ছে। গেলাম সেখানে। পেলাম গেমস ফ্রিক। সোমনাথ নেই।

কল্পনার চোখে মুখে নাকে চিবুকে সিকিমি টান থাকতে পারে, কিন্তু কথাবার্তায় খাঁটি বাঙালি। শিক্ষাদীক্ষা যে এই কলকাতায়। মঙ্গোলীয় বাঙালি ছাঁচে ঢালাই হয়ে গেছে। ফলে, সে সত্যিই একটা বস্তু। নইলে বাঙালি বর জুটিয়ে নেয়। এখন আমাকে কজায় আনার ফিকিরে আছে।

সোমনাথ দশে পা দিয়েছে। শিক্ষাদীক্ষা বাংলা আর ইংরেজিতে চলনসই, কানাড়া ভাষাও জানে। স্কুলে শিখেছে। তাই একটা চিরকুটে বাংলায় লিখলাম, সোমনাথ, এখানে থাকবি। তোকে খুঁজতে যাচ্ছি।

চিরকুট রাখলাম কিচেন ঘরের মেঝেতে। তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে গেলাম গিরিপথ দিয়ে ওকে খুঁজতে। সূর্য ঢলে পড়ছে। ছায়ার জগত বেড়েই চলেছে। যেন শলি ঢেলে ভরাট করা হচ্ছে খাদের গভীরতা।

হয়তো তেড়ালি মচকেছে ছেলেটার। খাদ বেয়ে উঠতে পারেনি। পা টেনে টেনে নেমে গেছে আরও নিচে। ঠাঁই নিয়েছে কারও ডেরায়। পাহাড় যে ওর। আত্মীয়।

পাহাড়েই আছে। উবে যায়নি। দশ বছর যার বয়স, সে এভাবে নিপাত্তা হয় না।

বাড়ির নিচের রাস্তায় পৌঁছে গাড়ি পার্ক করে রাখলাম। রাস্তায় নামলাম। আলো আরও তাড়াতাড়ি চম্পট দিচ্ছে। অন্ধকার গাঢ়তর হচ্ছে। চোখ চালাতে বেগ পাচ্ছি। হেঁকে ডাকলাম, সোমনাথ?

এখানে বাড়ি আছে তিনটে। প্রথম দুটোয় নেই সোমনাথ। তৃতীয় বাড়ির মালকিন বললে, পিছনের চত্বরটা দেখে যেতে। না, সেখানেও নেই ছেলেটা!

আবার স্টিয়ারিং ধরলাম। দু'পাশ দেখতে দেখতে যাচ্ছি। একটার পর একটা আলো জ্বলে উঠছে রাস্তায়। রাস্তা তো একটা নয়, অনেক। ছেলেটা কোন রাস্তায় সেঁধিয়েছে, বুঝব কী করে। মহা মুশকিলে পড়লাম। দু'বার গাড়ি দাঁড় করালাম। দুজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করলাম। না, কেউ দেখেনি জিনস আর সোয়েটার গায়ে দেওয়া কোনও ছেলেকে। এদিকে যে ঠাণ্ডা বাড়ছে। সোয়েটার এখন যথেষ্ট নয়।

বাড়ি ফিরলাম। সোমনাথ ফেরেনি। রান্নাঘরের মেঝেতে চিরকুট পড়েই আছে। কেউ ছোঁয়নি।

টহলদার প্রাইভেট সিকিউরিটিকে ফোনে জানিয়ে দিলাম। পাহাড়ি অঞ্চল তো। বেআইনি কাববারের ডিপো। তাই প্রাইভেট সিকিউরিটির বেশ রমরমা।

অনেকটা হালকা হলাম। ওরা ফোনে ফোনে খবর নেবে। সজাগ হয়ে গেল গোটা অঞ্চল।

ঠিক এই সময়ে বাড়ি ফিরল কল্পনা। অনেকটা পথ এসেছে গাড়িতে। ব্ল্যাক বিজনেস স্যুট ধসক গেছে। মুখে শ্রমক্লান্ত হাসি, সোমনাথ কোথায়?

ঘড়ি দেখলাম। ছ'টা বেজে দু'মিনিট। মোবাইলে কথা বলেছিলাম ঠিক একশো মিনিট আগে। বললাম, সোমনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কল্পনার মঙ্গোলীয় চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত হল। মুখে কথা নেই। মা যে। ভেতরে যে কি হচ্ছে, বাইরে ফোটাচ্ছে না। আমি ছোট্ট করে রিপোর্ট দিলাম। যা-যা করেছি ছেলেটার খোঁজে, সব বললাম। সব শেষে বললাম, এবার পুলিশকে টী

টেলিফোনটা বেজে উঠল ঠিক এই সময়ে! কল্পনা ছিটকে যাওয়ার আগেই আমি গেলাম। রিসিভার তুললাম। অপর দিক থেকে অমার্জিত কণ্ঠস্বরে বললে, ইন্দ্রনাথ রুদ্র নিশ্চয়? গুড। সোমনাথ এখন আমাদের খপ্পরে। ফিরিয়ে দেব। দাম চাই।

কত? গলা না কাঁপিয়ে বলেছিলাম।

ডিম, বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল ছেলে চোর।

০২. অনিক্স পাথরের ডিম

০২. অনিক্স পাথরের ডিম

আগের শীতে কলকাতার শিল্পমেলায় সেই প্রথম চিন আর পাকিস্তান আসর জমিয়ে বসেছিল। ছিল বাংলাদেশও। কিন্তু চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে শুধু পাকিস্তান। পাথরের শিল্পকর্ম দেখিয়ে। অনিক্স পাথর থেকে যে এত রকম জিনিস তৈরি হতে পারে, তা বুঝি জানা ছিল শুধু মোগল আমলে অথবা ভারত ভাগের আগে। এখন সে সব জিনিস আর আসে না। দেখার জন্যে হায়দ্রাবাদের সালারজাঙ মিউজিয়াম অথবা মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মারবেল প্যালেসে যেতে হয়। কিন্তু অনিক্স পাথর কুঁদে এত বিস্ময় সামগ্রী সে সব জায়গাতেও এমনভাবে জড়ো করা হয়নি, যে-ভাবে করা হয়েছিল ময়দানের শিল্পমেলায়।

ব্রিটিশ আমলে বাহারি কিন্তু বিপুল মূল্যের বস্তুগুলো চলে যেত প্রাসাদ সাজাতে। এখন যাচ্ছে গুজরাতি-মাড়োয়ারিদের অট্টালিকায়, আলিপুর-টালিপুর অঞ্চলের অভিজাত পরিবারদের বড় বড় নয়নসুন্দর সৌধগুলো তো তারাই কিনে নিয়েছে। গোটা বড়বাজার হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে। উত্তর কলকাতাতেও অনুপ্রবেশ ঘটছে। এই পৃথিবীর সেরা দশ ধনীর নাম করতে গেলে কলকাতার এই আধুনিক ধনীদের নাম এসে যায়। তৃতীয়জনই তো মাড়োয়ারি নন্দন। খাস কলকাত্তাই পিলে। মিত্তাল।

ময়দানের শিল্পমেলায় এরা এসেছিল। ভিড় করেছিল তেহরান, ইরান, মূলতান, বেলুচিস্তান থেকে পাথরের কারিগর ব্যবসায়ীরা। স্টল উপছে পড়েছে তাদের চোখ ধাঁধানো শিল্প সামগ্রীতে—থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল স্টলের বাইরে-মাঠের ওপর।

কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা অবশ্যই ছিল। কলকাতার নামযশ তো অকারণে হয়নি। মরু উদ্যান যে।

সেই সুনাম রক্ষাও করেছিল কলকাতা। হাত সাফাই বিদ্যায় মহাপটু শিল্পীরা ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দিয়েছিল তাবড় তাবড় রক্ষীদের বোকা বানিয়ে দিয়ে। কলকাতা যে সেরা ম্যাজিশিয়ানের শহর।

উধাও হয়ে গেছিল এক বাক্স অনিক্স পাথরের ডিম।

সাইজে হাঁসের ডিমের মতো, কিন্তু চেহারায় একটু অন্যরকম। সারা গায়ে রকমারি রঙের শিরা-উপশিরা। পাথরের বুক কেটে তৈরি তো, তাই। ঝিকিমিকি দ্যুতি সর্বাঙ্গে। এক-একটা বাক্সে সাজানো ছ'টা করে ডিম। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে তাক লেগে যায়। বারে বারে দেখতে ইচ্ছে যায়। ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখতে ইচ্ছে যান। দাম তো অতি সামান্য। মাত্র পঞ্চাশ টাকা-এক-একটা পিস।

শিল্পরসিক কিন্তু সীমিত রেস্তর বঙ্গতনয় এবং তনয়ারা এই ডিম কিনেছে অনেক। কিন্তু ছ'টি ডিম সমেত একটা প্যাকেট নগদ মূল্য দিয়ে এক ব্যক্তি নিয়ে যায়নি। ম্যাজিক দেখিয়ে মেরে দিয়েছে। ঈগলচক্ষু নজরদারিদের চোখে ধুলো দিয়ে।

বোধহয় ত্রাটক যোগে সিদ্ধ ছিল সেই ব্যক্তি। সেই যোগ, যার অভ্যাসে পুরাকালের মুনিঋষিরা সম্মোহন করতেন বনের পশুদেরও।

যোগী-তস্কর কিন্তু বড় অল্পে তুষ্ট! অনেক মূল্যবান অনিক্স পাথরের সামগ্রী নিচয় থেকে ভ্যানিশ করে দিয়েছিল শুধু ছ'টি ডিম। মাত্র ছ'টি ডিম।

সংবাদ মাধ্যমকে এই চৌর্য পর্ব জানানো হয়নি। তাহলে টি টি যত না পড়ত, তার চেয়ে বেশি সজাগ হয়ে যেত ডিম-জাদুকর। কিন্তু আমি জেনেছিলাম। কেননা, ডিম ছ'টা অনিক্স পাথরের খোলস ধারণ করে গোপন করে রেখেছিল পৃথিবী সেরা বেশ কিছু হিরে। সিকিউরিটিতে যারা ছিল, এ সংবাদ তাদের ছিল না। জানানো হয়নি। জানতাম শুধু আমি। আমার ওপর সেই ভার দেওয়া হয়েছিল বলে।

না, আমার চোখে ধূলো দেওয়া যায়নি। আমি জানি সেই ডিমের গতিপথ, গন্তব্যস্থল এবং বর্তমান অবস্থান।

এই ডিমই চাওয়া হয়েছিল টেলিফোনে। সোমনাথ গায়েব হয়েছে এই কারণেই। অলমতিবিস্তরেণ। প্রসঙ্গটা নিয়ে সবিস্তার হওয়া যাবে পরে...যথাসময়ে। গুপ্ত

রহস্য যে! যতক্ষণ গুপ্ত থাকবে, ততক্ষণ সে এই কাহিনি পড়বেন। জেনে গেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। কারণ, আমি লেখক নই বন্ধুবর মৃগাঙ্কর মতো!

০৩. হিরে মাস্টার রবি রশ্মি

০৩. হিরে মাস্টার রবি রশ্মি

রবি রে আমার কলমের ডগায় এসে যাচ্ছে। ওকে নিয়ে দু'চার কথা না লেখা পর্যন্ত আমার এই কাহিনি প্রকৃত গতি পাবে না। ইংরেজিতে যা রে, বাংলায় তা রশ্মি। তার রশ্মি ছড়িয়ে আছে চমকদার এই উপাখ্যানের প্রতিটি পংক্তিতে। তার ছেলে গায়েব হয়েছে, কিডন্যাপার মুক্তিপণ চেয়েছে, আর কিছু নয়—ডিম। পাঠক এবং পাঠিকার, কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে এই ডিম প্রসঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ না লিখে পারেনি আমার এই নাছোড়বান্দা লেখনী। হিরেদের আত্মা যেন কলমে ভর করে লিখিয়ে গেল নিজেদের কাহিনি। অনিক্স পাথরের ডিম-কাহিনি।

কিন্তু সেইসঙ্গে এসে যাচ্ছে রবি রশ্মি কাহিনি। রবি যখন রায় পদবীকে কেটে হেঁটে শুধু রে বানিয়েছিল, তার আগে থেকে ওকে আমি চিনি।

অবাক হওয়ার মতো ব্যাপারই বটে। যার ডিভোর্সি বউ এখন আমাকে কজায় আনার ফিকিরে গ্যাংটকের তুহিনশীতল পাহাড়ি অঞ্চলে নিবাস রচনা করেছে, আমি সেই রবি রে-কে চিনি এবং জানি তার কৈশোর থেকে।

এই কলকাতায়, আমি সেই আদি কলকাতার কথা বলছি, যেখানে একদা ক্রীক রোর খাল বেয়ে নৌকো চালিয়ে এসে লর্ড ক্লাইভ সুরাজ ট্যাঙ্ক লেন দিয়ে হেঁটে বৈঠকখানার বটগাছতলায় হুঁকো টানার আসরে বসতে, সুপ্রাচীন সেই মধ্য কলকাতায় মুচিপাড়া নামে একটা অঞ্চল আছে! একসময়ে খুবই কুখ্যাত ছিল এই থাকা অঞ্চল।

এই তল্লাটেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল রবীন্দ্ররঞ্জন রায়বর্মণ। বিশাল নাম। কিন্তু মানুষটার সাইজ অতবড় নয়। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হাইটের পাতলা হিলহিলে একটা মানুষ। অতিশয় ডাকাবুকো। পাড়ার হাওয়া গায়ে লাগিয়ে বড় হতে হতে সে অনেক কাণ্ড

করে ফেলেছে। বোমা বেঁধেছে, বোমা মেরেছে, বেপাড়ার মস্তানদের মুচিপাড়ায় মস্তানি করতে দেয়নি। মেয়েদের সম্মান দিয়ে গেছে, মেয়েরাও ওকে বিপদ-আপদের পরম বন্ধু বলে জেনেছে।

কিন্তু অতবড় নাম নিয়ে কি কেউ বড় হতে পারে? জেট যুগে এ নাম অচল। তাই স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে যখন বেরিয়ে এল দামাল মানুষটা, তখন ওর নাম কাটছাঁট করে এসে দাঁড়ালো রবি রে'তে।

এইবার শুরু হল ওর অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক জীবনের আর এক পর্ব। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ নিয়ে গোটা ভারতে চক্কর মারার সময়ে বোম্বাইয়ের হিরে কারবারিদের সংস্পর্শে এসেছিল রবি রে। ওর মধ্যে যেন একটা ন্যাচারাল ম্যাগনেট আছে। অজানার দিকে ছুটে যাওয়ার ম্যাগনেট। যেখানে রহস্য, সেইদিকে ধেয়ে যাওয়ার প্রবণতা। ভারত ভ্রমণের এই চাকরিতে ঢুকেছিল আতীব্র এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই। বোম্বাইতে ওকে টেনে ধরল এই পৃথিবীর হিরে কারবারিদের আশ্চর্য দুনিয়া। হিরের টুকরো ছিল ছেলেবেলা থেকেই। এখন সে চলে গেল প্রকৃত হিরের জগতে...

সুদীর্ঘ সেই কাহিনি সবিস্তারে লিখতে গেলে, এই উপাখ্যান একটা থান ইটের মতো ভারি হয়ে যাবে। হিরের দুনিয়াটাই যে রোমাঞ্চকর। রোমাঞ্চ স্পৃহা যার প্রতিটি রক্তকণিকায় নৃত্য করে যায়, সে তো রোমাঞ্চময় হিরের কারবারের একদম ভেতরে ঢুকে যাবেই। অসম্ভব ডানপিটে, অসম্ভব কৌতূহলি, অসম্ভব উপস্থিত বুদ্ধির মানুষ রবি রে। তাই একটা সময়ে আপন রশ্মি বিকিয়ে দুনিয়া জোড়া হিরে আবাদের নাড়ি-নক্ষত্র আঙুলের ডগায় জড়ো করে নিয়েছিল।

শুরু হয়েছিল লোপাট হয়ে যাওয়া বিশাল এক হীরক খণ্ড থেকে। আকাটা হিরে। ওজন ২৬৬ ক্যারাট। পাঠক এবং পাঠিকার অবগতির জন্যে জানিয়ে রাখি, এক গ্রাম ওজনের এক পঞ্চমাংশ হল এক ক্যারাট।

বোম্বাইয়ের গদি থেকে বিপুলাকার এই হিরের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে গোপন তদন্ত অভিযানের প্রয়োজন হওয়ায় তলব পড়েছিল আমার। এই হিরে এসেছিল কঙ্গোর খনি থেকে। নিরুদ্দেশ হওয়ার পর সেই হিরেকে খুঁজে বের করেছিলাম নিউইয়র্ক সিটিতে। হিরের খোঁজে থেকেই কোটি কোটি ডলারের খনির খোজ পেয়েছিলাম, রক্তাক্ত সংঘর্ষের বিবরণ পেয়েছিলাম।

মূলে শুধু হিরে! কয়লা থেকে জন্ম নেওয়া একটা পাথর। মহাকাল বুঝি স্তব্ধ হয়ে যায় তার রূপের সামনে। রূপমী হীরক। তোমাকে নমস্কার। হিরের ডিমের প্রসঙ্গে এবার ফিরে আসা যাক। এবং সে কাহিনি শোনানো যাক হীরক-কন্যা কল্পনা চিটনিসের জবানিতে।

০৪. কল্পনার ছলনা কাহিনি

০৪. কল্পনার ছলনা কাহিনি

রবি আমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বলত, কল্পনা আমার কল্পনা, ছলনাময়ী ললনা, কামরূপ থেকে কী শিখে এলে, বল না প্রিয়া, বল না!

আমি ওর বিদ্যুৎ চঞ্চল চোখে চোখ রেখে বলতাম, পঞ্চবাণ, পঞ্চবাণ!

ও বলত, কী নাম? কী নাম?

আমি বলতাম, সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন আর স্তম্ভন।

ও বলত, তোমার ঘোট ঘোট চোখে তাই বুঝি এত বিদ্যুৎ।

আমি রেগে যেতাম। এই একটি ব্যাপারে খোঁচা মারলে মেজাজ খিঁচড়ে যেত। হ্যাঁ, আমার চোখ ছোট। একটু তেড়চাও বটে। মায়ের দিক থেকে পেয়েছি। মা ছিল হিমালয়ের মেয়ে। হিমকন্যাদের চোখ ওই রকমই হয়। দীঘল চোখ যাদের থাকে, তাদের মনের তল খুঁজে পাওয়া যায়। চোখ যে মনের আয়না। খুদে চোখে সেই মন সবটুকু ভেসে ওঠে না। আমারও ওঠে না। আমি গহন গভীর মনের অতল কোণে লুকিয়ে রেখে দিতাম আমার আসল চাহিদা। আমি চাই হিরে…এই পৃথিবীর জঠর থেকে তুলে আনা কঠোর পাথর, যার জলুস আর যার হিপনোটিক দ্যুতি বাড়িয়ে দিক আমার কামরূপ বিদ্যা।

না, কামরূপ-টামরূপ আমি যাইনি। কিন্তু চলমান চুম্বকের মতো যে কোনও পুরুষকে আমি টেনে ধরে নিংড়ে নিতে পারি। তাতেই আমার আনন্দ, তাতেই আমার আবেশ।

রবি রশ্মিকে আমি টেনে ধরেছিলাম ঠিক এই মতলবেই। সে যে নিখাদ হিরে, তা তো আমা;, জহুরি চোখ দিয়েই যাচাই করে নিয়েছিলাম। আমরা মেয়েরা এই একটি ব্যাপারে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা রাখি। বিশেষ করে আমি রাখি। কারণ আমি হিমালয়ের মেয়ে। পুরাণ-টুরাণে আমাদেরকেই বলা হয়েছে বিদ্যাধরী। হিমলোক থেকে নেমে এসে মর্ত্যলোকের সুধা পান করে গেছি চিরকাল। করছি এখনও, নিংড়ে নিচ্ছি এই হীরক-যুবক রবি রে'র সত্তা থেকে।

নানান নিভৃত জায়গায় প্রেমালাপের সময়ে রবি আমাকে বলে গেছে ওর হীরক অনুসন্ধানের শিহরণ জাগানো কাহিনি। ওর মুখেই শুনেছি, হিরে ওকে টানে…ওর অণু-পরমাণুতে টান ধরায়। ও বোধহয় আগের জন্মে জহুরি ছিল…মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে হিল্লিদিল্লি ঘুরতে ঘুরতে বোম্বাইয়ের জহর বাজারে যেদিন থেকে ঢুকেছে, সেইদিন থেকে পূর্ব-পূর্ব জন্মের নেশা যেন ওকে পাগল করে দিয়েছে। ও যখন হিরে নিয়ে কথা বলত, তখন সত্যিই যেন ও আর এক মানুষ হয়ে যেত…ওর চোখের তারায় তারায় হিরের জলুস, হিরের কিরণ, হিরের কাঠিন্য দেখতে পেতাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হিরের কাঠিন্য। কঠিন কঠোর কুলিশ কালো হয়ে যেত ওর দুই কনীনিকা। ওর অতীতু আমি জানি। আমাকে বলেছে মরণকে ও ডরায়নি। আজও ডরায় না। তাই প্রাণের পরোয়া না করে হিরের টানে ঢুকে গেছিল হিরের জগতে।

ময়দানে বসে একদিন ও পকেট থেকে রুমাল বের করে আমার মুখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, কল্পনা, হিরে ছুঁইয়ে তোমাকে বরণ করলাম।

আমি আমার ছোট ছোট চোখে বিপুল বিস্ময় জাগিয়ে বলেছিলাম, হিরে চুইয়ে? ছোঁয়ালে তো রুমাল।

ও বলেছিল, হাত পাতো।

আমি পেতেছিলাম। রুমাল ঝেড়ে একটা হিরে আমার হাতে ফেলে দিয়েছিল দুষ্টু রাজা রবি রে। আমার এই ছোট ছোট চোখ জোড়া নিশ্চয় সেদিন পদ্মদীঘির মতো বড় হয়ে গেছিল। পড়ন্ত রোদে যেন হাজার সূর্য ঝিকমিকিয়ে উঠেছিল আমার হাতের ছোট্ট তেলোয়।

অপলকে চেয়েছিলাম চৌকোণা ধোঁয়াটে সাদা পাথরটার দিকে। বলেছিলাম, অস্ফুট স্বরে, হিরে! এইরকম!

ঠোঁটের কোণে কোণে ওর সেই বিচিত্র কুহেলি হাসি ভাসিয়ে রবি বলেছিল, আরও আছে। দেখবে? বলে, আমার জবাবের প্রতীক্ষা না করে ঘাসের ওপর রুমাল পেতে, ছোট্ট একটা ডিবে বের করেছিল পকেট থেকে। নিতান্ত অবহেলায়। ডিবে উপুড় করে দিয়েছিল রুমালের ওপর।

স্তম্ভিত নয়নে দেখেছিলাম রাশিকৃত খুদে হিরে। বিষম তাচ্ছিল্যে খুদে বজ্রমণিদের সাজিয়ে একটা পিরামিড তৈরি করেছিল আমাকে বোবা বানিয়ে রেখে।

'বজ্রমণি' শব্দটা ওর কাছেই শিখেছিলাম। ওষুধের কারবারে নেমে হিরে নিয়ে ওর এই মাতামাতি প্রথম প্রথম আমার ভাল লাগেনি। বেপরোয়া ও চিরকাল, ওর মুখেই শুনেছি, যা ভাল মনে করেছে। তাই করেছে। কারও কথায় কান দেয়নি। কিন্তু হিরের জগতে এইভাবে যে ঢুকে গেছে, তা তো জানতাম না।

আমার ছোট ছোট চোখের বিস্ময়-বিস্ফোরণ দেখতে দেখতে রবি বলে গেছিল—কল্পনা, কুচি কুচি এই হিরেদের প্রত্যেকের একটা করে ইতিহাস আছে।

আমি বিহ্বল গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, পেলে কোত্থেকে?

কঙ্গোর অ্যাংগোলান হিরের খনি থেকে।

কঙ্গোর হিরে! কলকাতার ময়দানে!

ও আমার কথা যেন শুনতেই পেল না। বলে গেল আপন মনে-অকট্যাহেড্রাল পাথর। প্রত্যেকটায় আছে আটটা দিক—প্রতিটা দিক সমান মাপের। অষ্টহস্ত পাথর—হিরে…আমার হিরে!

যেন আবিষ্ট গলায় কথা বলে যাচ্ছিল রবি রে…সেইদিন…সেই পড়ন্ত রোদের রোশনাইতে দুই চোখের হিরে ঝিকমিকিয়ে পকেট থেকে বের করেছিল একটা ছোট্ট ডিজিট্যাল স্কেল-দাঁড়িপাল্লা আর একটা পরিষ্কার সাদা কাচ। হিরের পিরামিডের পাশে রেখেছিল এক-তা সাদা কাগজ। খুদে চিমটে দিয়ে একটা হিরে তুলে নিয়ে কাচের প্লেটে রেখে, কাচটা রেখেছিল সাদা কাগজের ওপর।

বলেছিল, কল্পনা, এইভাবেই দেখতে হয় হিরের মধ্যে কলঙ্ক আছে কি না।

ফস করে আমি বলে ফেলেছিলাম, যেমনভাবে দেখেছ আমার ভেতরটা?

তুমি? নিষ্কলঙ্ক হিরে…আপন মনে, যেন ঘোরের মাথায় বলে গেছিল হিরে-পাগল রবি রে। প্রেমে পড়লে পুরুষমাত্রই অন্ধ হয়ে যায়। আমার মতো কাচকে তাই হিরে ভেবে নিয়েছিল। মেয়েরা চিরকাল এইরকমই হয়। এই আমার মতো। মুনিঋষিরও মতিভ্রম ঘটে।

মরুক গে। হিরের কথায় আসা যাক।

খুদে চিমটে দিয়ে আর একটা হিরে তুলে নিয়ে আমার পলকহীন খুদে চোখের সামনে নাড়তে নাড়তে আবিষ্ট স্বরে বলে গেছিল হিরে ধুরন্ধর রবি রে—এটার নাম মাকবর।

আকবরের হিরে নাকি?

ন্যাকার মতো কথা বলো না। আকবর হিরে-সমঝদার ছিলেন বলেই তার স্মৃতি রাখবার জন্যে এর নাম মাকবর।

দাম?

কথাটা তুলেও তুলল না রবি। বলে গেল আপন মনে-বড় কঠিন…বড় কঠিন এই হিরেরা—এদের গায়ে আঁচড় কাটতে হলে চাই আর একটা হিরে…হির ছাড়া হিরের গায়ে দাগ কাটতে কেউ পারে না।

কেউ পারে না বললে কেন? চোখের চকমকিতে ঝিলিক ছিটিয়ে আমি বলেছিলাম। আমি তো পেরেছি।

চোখে চোখে চেয়ে রবি রে বলেছিল, কারণ তুমি নিজেই যে বজ্রমণি।

আমি কিন্তু সেদিন, সেই ময়দানে, সূর্যদেবের পাটে বসার আলোয়, রবির চোখে দেখেছিলাম খুদে খুদে বজ্রমণি।

বজ্রমণি চোখেই আমার দিকে অনিমেষে চেয়ে থেকে ও বলে গেছিল, হিরে মহাশয়দের আর একটা গুণ আছে, কল্পনা।

কি গুণ, হে মোর বজ্রমণি?

বড় ঠাণ্ডা—বড় ঠাণ্ডা। ছুঁলেই হাত থেকে তাপ টেনে নেয়।

যে হেয়, তাকেও পাথর বানিয়ে দেয়?

হ্যাঁ।

আজ, এতদিন পরে সন্দেহ হয়, রবি রে কি নসত্রাদামুস বিদ্যে জানে? ভবিষ্যৎ দেখতে পায়? আমি, এই কবোষ্ণ কল্পনা, একদিন যে কঠিন প্রস্তর হয়ে যাব–কি ও দিব্য নয়নে দেখতে পেয়েছিল? নাকি, আলগোছে বলে ফেলেছিল আমাদের নিয়তি! কে জানে!

০৫. পেশোয়ারের পাথর

০৫. পেশোয়ারের পাথর

আমার এই ভাঙা কলম উসখুস করছে আমার কথা জবানিতেই লেখার জন্যে। মৃগাঙ্ক বলে বটে, কলম নাকি নিপ্রাণ থাকে না কাগজে চরণ ছোঁয়ালেই। আরবি অশ্বের মতে তখন কলম ছোটে, সূক্ষ্মজগত থেকে অযুত শক্তি এসে কলমে ভর করে। কলমকে প্রাণময় করে দিয়ে তারা লিখিয়ে নেয় অনেক…অনেক মহাসত্য —যা সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়। লেখনীমনস্ক মানুষরা তাই প্রপঞ্চময় দুনিয়া সৃষ্টি করে যায় অনায়াসে–নিজেদের অজান্তে।

ও একটু বাড়িয়ে বলে, একটু কেন, বেশ বাড়িয়ে বলে। যে যার নিজের কোলে ঝোল টানে। তবে হ্যাঁ, মৃগাঙ্ক যখন লেখে, তখন দেখেছি, ও যেন অন্য মানুষ হয়ে যায়। আমাকে চিনতে পারে না, নিজের অমন দশরূপা বউকে চিনতে পারে না- আমি তো ছার।

যে দশা এই মুহূর্তে আমার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আমি তো কলমবাজ কস্মিনকালেও ছিলাম না। বকমবাজ আর বন্দুকবাজ বলে বিস্তর দুর্নাম আছে বটে, বউদি কবিতা আমাকে যখন তখন আর একটা বিষয়ে বিষমবাজ বলে—সে শব্দটা 'মা' অথবা 'মা' দিয়ে শুরু। শরৎ সাহিত্যে এই শব্দটা যখন তখন এসে গেছে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে তা অচল। অশ্লীল। দরকার কি? বিশেষ করে, বিশেষণটা যখন সর্বৈব মিথ্যে! বউদিরা স্নেহের দেওরদের অমন বচন বিশেষণে যখন তখন। ভূষণ পরায়।

সত্যিই আমি অ-লেখক। কি লিখতে বসে, কি লিখছি। একেই বলে কুণ্ড রচনা।

হিরে নিয়ে রবি রে মেতেছিল বোম্বাইয়ের হিরের বাজারে ঘুর ঘুর করার সময়ে। ওর ব্যক্তিত্ব আছে, বাহাদুরি আছে, কোথাও সুঁচ ঢোকানো ছিদ্র পেলেও

অনুসন্ধিৎসার আকর্ষণে নিমেষে অন্দরে প্রবিষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এইভাবেই পেশোয়ারের পাথরের সন্ধান ও পেয়েছিল।

সে পাথর হিরে পাথর। আফগানিস্তানের বর্ডারে, পেশোয়ারের রুক্ষ পর্বতময় এক পরিত্যক্ত দুর্গ প্রাসাদে পড়ে থাকা এক কাঁড়ি আকাটা হিরে পাথর! ধূমল পাহাড়ের বিবর থেকে তুলে এনেছিল নক্ষত্রপ্রতিম পাথরদের।

গায়ের রক্ত চনমনে করে তোলার মতো সেই কাহিনি রবি রে আমাকে শুনিয়েছিল এই কলকাতায় বসে—যখন আর একটা সজীব পাথরের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রয়েছে। কল্পনা…কল্পনা যে কি বস্তু—তা আগের অধ্যায়ে লেখবার চেষ্টা করেছি। মাকবর হিরে ওকেই প্রথম দেখিয়েছিল ময়দানের ঘাসের কার্পেটে বসে। বুকের পাটা আছে বটে। যে মরুদ্যান ময়দানে চোর-ছ্যাচোড় খুক খুক করছে, সেই ময়দানে বসে প্রেমিকার চোখে কীর্তিমান হওয়ার জন্যে ফস করে দেখিয়ে ফেলেছিল মাকবর হিরে।

সে যাক, প্রেমে পড়লে সব পুরুষই গর্দভ হয়ে যায়। আমি বাদে। আমি কখনও প্রেমে পড়িনি। পড়িয়েছি অনেককে। কার্যসিদ্ধির জন্যে। যেমন এই কল্পনা চিটনিসকে। বিশেষ মতলবে। এবং তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

এই মুহূর্তে আসা যাক হিরের জগতে।

রবিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম–তুই চিরকাল মারকাটারি মানুষ, তা আমি জানি। কিন্তু লোভী নোস। হিরের টানে হঠাৎ পাগল হয়ে গেলি কেন? ছিলিস তো ওষুধ নিয়ে–

রবি রে ওর সেই বিখ্যাত খলিফা হাসি ঠোঁটের কোণে টেনে এনে বলেছিল, ইন্দ্র, আমি চাই অজানাকে জানতে। আমি চাই অ্যাডভেঞ্চার। হাজার হাজার বছর ধরে হিরে রয়েছে অনেক…অনেক অ্যাডভেঞ্চারের মূলে। অনেক চক্রান্ত, অনেক যুদ্ধ, অনেক যশ, অনেক অর্থ, অনেক অনর্থর মূলে। হিরে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি টানে—

আমি হেসে বলেছিলাম, বুঝেছি।

রবি শক্ত চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। ওর র‍্যামবো মার্কা ফিগারে চোখ দুটো যেন দু'টুকরো পাথর। সেই পাথরে প্রাণের আভাস নেই। চেহারাখানা জাঁদরেল। কুস্তি, যোগব্যায়াম, যুযুৎসু, সাঁতার—এইসব করে ছেলেবেলা থেকেই নিজেকে জ্যান্ত কৃপাণ বানিয়ে রেখেছে। ও বেপরোয়া, মরণের ভয় নেই, কিন্তু জানার স্পৃহা অফুরন্ত।

তাই শক্ত চোখে আমার দিকে যখন চেয়ে রইল, আমার মনে হল, হিরে-পিপাসার শেকড়টা রয়েছে অন্যত্র—নিছক রূপসী আকর্ষণের জন্যে নয়।

চোখে চোখে চেয়ে বলেছিলাম, সোজা কথায় বল, ওষুধের মার্কেট ছেড়ে হিরের মার্কেট ধরলি কেন?

সেই প্রথম হিরের ঝলক দেখলাম ওর চোখে।

বললে, মার্কেট? দ্যাটস দ্য ওয়ার্ড! মার্কেট! ইন্দ্র, তুই অনেক জানিস, কিন্তু জানিস না, কি বিরাট মার্কেট গড়ে উঠেছে এই হিরে নিয়ে। হিরে নাকি অভিশপ্ত। হোক। কিন্তু হিরে আনে টাকা। টাকার ডোবা নয়, পুকুর নয়, হ্রদ নয়—টাকার সমুদ্র। আমি সেই সমুদ্র রচনা করতে চাই এই দেশে—এই গরিব ভারতে—যে ভারতের সম্পদ শুষে আজ অন্য দেশগুলো ধনী হয়েছে।

ওর গলা কাঁপছিল। চোখ জ্বলছিল। আমি চুপ মেরে গেছিলাম। উসকে তো দিয়েছি।

আত্মগতভাবে বলে গেছিল রবি-পেশোয়ারের পাথর! পেশোয়ারের পাথর। রুক্ষ পাহাড়ি জায়গায় ভাঙা কেল্লার পাথর চাপা গুহায় আকাটা হিরের স্তূপ। ভাবা যায়?

টুকুস করে বলেছিলাম—গুপ্তধন?

কথার রাশ টেনে ধরেছিল রবি তৎক্ষণাৎ। বুদ্ধদেব স্টাইলে অর্ধনিমীলিত নয়নে আমার দিকে চেয়েছিল। তারপর বলেছিল—সেই প্রসঙ্গে আসবার আগে তোকে বলব, শুধু তোকে বলব, আমি কী দেখে এসেছি, কী শিখে এসেছি—গোটা পৃথিবীটায় চক্কর দিয়ে।

ডেঞ্জারাস ডায়মণ্ড দুনিয়ার অতি শ্বাসরোধী কাহিনি বলে গেছিল তার পরেই।

ডায়মণ্ড! ডায়মণ্ড! ডায়মণ্ড! নিছক কয়লা থেকে তো তোমার জন্য ধরিত্রীর জঠরে, কিন্তু কল্পনাতীত একী সাম্রাজ্য রচনা করেছ তোমার একল্পনীয় ঐশ্বর্য দিয়ে?

০৬. ডায়মণ্ড কাহিনি ও বর্ণময় রবি রে

০৬. ডায়মণ্ড কাহিনি ও বর্ণময় রবি রে

দুর্দান্ত ভিলেন হলেও সিনেমায় হিরো হয়ে যেতে পারত রবি। কিন্তু ভাল মানুষের চরিত্র নিয়ে ভিড়ে গেছিল কল্পনা চিটনিসের সঙ্গে।

কিন্তু সেটা পরে। তার আগে…

তরতাজা যুবক রবি রে প্রথম থেকেই নজর কেড়েছিল বম্বের জহুরিদের। ওর চেহারা, ওর গলার আওয়াজ-সব কিছুই মার্কামারা। হীরক বাণিজ্যের অন্ধকার দিকটায় এমন একটা ক্যারেক্টারকে খলনায়ক হিসেবে নামিয়ে দেওয়া যায় কিনা, ভেবেছিল হিরে বাণিজ্যের জাদুকররা।

দুর্দান্ত অভিনেতা রবি রে সেই ভূমিকা নিয়েই ঢুকে গেছিল হিরের আড়ালের অন্ধকার জগতে। এটা ছিল একটা ইমেজ। সেটা ভাঙিয়েছে। বেঙ্গল ব্রেন তো। আবার অন্য ভূমিকায় কল্পনা চিটনিসের মনের জগতে তুফান রচনা করে গেছে। কখনও সে ব্যাড়ম্যান, কখনও গুডম্যান। বিশাল চেহারা, চোখের অদ্ভুত এক্সপ্রেশন, আর গম্ভীর গলার স্বর দিয়ে নাচিয়ে মজিয়ে ফিনিশ করে দিয়েছে হিমালয় কন্যাকে।

আর, ব্যক্তিত্বের এই চাবিকাঠি কাজে লাগিয়েই ঢুকে গেছিল ঝকমকে হীরক সাম্রাজ্যের তমসাময় নিতল আলয়ে…

হিরে, হিরে, হিরে! পাথর, কিন্তু নিরতিশয় ঘন। এত ঘন যে সবশক্তিমান সূর্যদেবের কিরণকেও অক্লেশে যেতে দেয় না নিজের ভিতর দিয়ে। আলোর গতিবেগ ব্যাহত করবার ক্ষমতা যদি কারও থাকে, তবে তা আছে এই হিরে নামক পাথরের। একটু রুখে দেয় আলোর স্পীডকে…সূর্যালোক তখন তিনভাগে একভাগ। গতিবেগ হারায়। তিন ভাগের দু'ভাগ স্পীড নিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে যায় অপর দিক দিয়ে এরই নাম হিরে। আশ্চর্য পাথর হিরে। পৃথ্বী-জঠরের নিরেট প্রস্তর—হিরে… চমকদার হিরে!

সুপ্রাচীন কাল থেকে এই হিরে সাম্রাজ্যকে গড়ে নিয়েছে মা পৃথিবী। মানুষ মায়ের গর্ভে যেমন তিল তিল করে বেড়ে ওঠে মানব শিশু, পৃথিবী জননী সেই প্রক্রিয়ায় না গিয়ে বিপুল চাপের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি করেছে গর্ভের ঐশ্বর্যদের। টাইটানিক প্রেসার দিয়ে যায় কার্বনের ওপর। সেই সঙ্গে বিপুল তাপ। পৃথিবী যখন তরুণী, এই কাণ্ড করে গেছে তখনই। রচনা করেছে হিরে। এবং…

লুকিয়ে রেখেছিল গর্ভের গভীরতম স্তরে…করে কদরে…প্রায় দশ কোটি বছর আগে। তারপর উগরে দিয়েছে গলিত পাথরের সঙ্গে। যে পাথরের নাম কিমবারলাইট।

গাজর আকারের বিস্তর সরু সরু ফানেলের মধ্যে গর্ভজাত কিমবারলাইট শীতল হয়েছে একটু একটু করে। ভূ-স্তর থেকে ঠেলে বেরিয়ে থেকেছে গাজর-সদৃশ এই হীরক আধারদের স্থূল গোলাকৃতি দিকগুলো। লক্ষ লক্ষ বছরের বৃষ্টি আর ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য একটু একটু করে ক্ষইয়ে দিয়েছে কিমবারলাইট পাথরের ভূ-স্তরের দিক…

হিরে-প্রসব ঘটেছে তখনই। ধরণীর ওপরের স্তরে ছড়িয়ে গেছে হিরে…জলস্রোতে গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে জমা হয়েছে নদীর তলায় অথবা নরম মাটিতে, যে মাটির নাম লুণ্ডাসুল…

চোখের হিরে নাচিয়ে নাচিয়ে হিরে সৃষ্টির কাহিনি শুনিয়ে গেছিল বাংলার বাঘ' রবি রে। বলেছিল, লাকি হিরে সন্ধানীরা এই পাথরদেরই খুঁজে খুঁজে ঘরে তুলেছে, খদ্দের জুটিয়েছে। খনি থেকে তুলে এবড়ো-খেবড়ো শ্রীহীন এই পাথরদের জন্যেও হামলা চালিয়েছে হিরে ডাকাতরা। জলুস নেই যেসব পাথরের, হিরে-জহুরিরা সেইসব শ্রীহীন পাথর কজায় আনবার জন্যে অনেক অমানুষদের মোতায়েন করেছে। ইন্দ্র, হিরে তাই বুঝি একাধারে লক্ষ্মী আর অভিশাপ।

গলা কাঁপছিল রবির। আমি বাগড়া না দিয়ে শুনে যাচ্ছিলাম। কথা বলার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছিল—ওর সম্মোহনী কথার তোড়ে…

তারপর রেখেছিলাম ছোট্ট একটা প্রশ্ন-রবি, হিরের মধ্যে আছে রোমান্স, আছে শক্তি, আছে বিউটি, আছে সম্পদ। তাহলে কেন এই পৃথিবীর যে কোনও জিনিসের চেয়ে এই হিরে জিনিসটা মানুষের কল্পনায় এমন আগুন ধরিয়ে দেয়, নিচ স্পৃহাগুলোকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দেয়?

রবি তখন যেন ঘোরের মধ্যে ছিল। আমার প্রশ্নটা কানের মধ্যে দিয়ে মাথায় ঢুকে সঙ্গত বৈদ্যুতিক ছন্দ নির্মাণ করতে একটু সময় নিল। যা ঘটে নিমেষে, তা ঘটল একটু দেরিতে। হিরে এমনই জিনিস। চিন্তার গতিকেও মন্থর করে দেয়, যেমন করে আলোর গতিকে। তারপর শুনিয়ে গেছিল অনেক অনেক ব্যাখ্যা। অলৌকিক রহস্য থেকে শুরু করে মানুষের কদর্য লালসা—কিছুই বাদ দেয়নি। হিরে রয়েছে সব কিছুর মূলে। মানুষকে পিশাচ বানিয়ে দিচ্ছে হিরে-যার এক-এক

কণায় বিধৃত রয়েছে অসংখ্য সৌন্দর্য-কণা।

হিরে…অব্যাখ্যাত রহস্যের আধার হিরে।

কোনও জবাবই আমার মন ভরিয়ে দিতে পারেনি। রবি নিজেও আজও খুঁজে পায়নি-হিরে মানুষকে কেন এভাবে টানে। এ এক আশ্চর্য আকর্ষণ।

প্যারিস শহরে প্রদর্শনী হচ্ছিল। রবি ছিল সেখানে। রগড় দেখবার জন্যে নয়, মার্কেট যাচাই করার জন্যে। তুমুল বৃষ্টি তখন ধুইয়ে দিচ্ছিল গোটা শহরটাকে। বরুণদেবের বিষম নৃত্যকে উপেক্ষা করে মহিলারা দলে দলে কেন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিরে দেখবার জন্যে, সকৌতুকে এই প্রশ্ন করেছিল রবি।

চোখের হিরে নাচিয়ে নাচিয়ে সুন্দরীরা বলেছিল, নক্ষত্র। নক্ষত্র! হিরে যে আদতে নক্ষত্র!

রূপসীদের চোখে হিরে নিছক তারকা হতে পারে, হিরে কারবারিদের কাছে হিরে মানেই টাকা টাকার পাহাড়! মণি থেকে মুদ্রা—বিপুল পরিমাণে। নইলে বুলডোজার চালিয়ে লণ্ডনের মিলেনিয়াম ডোম তছনছ করতে যাবে কেন হিরে ডাকাতরা? দু’হাজার সালের নভেম্বরে ঘটেছিল পিলে চমকানো এই ডাকাতি। থ’

করে দিয়েছিল হিরে বণিকদের। রবি রে'র দর বেড়েছিল এই ঘটনার পর থেকেই। ওর ওই র্যামবো মার্কা ফিগারটার জন্যে।

০৭. যমজ হিরে

০৭. যমজ হিরে

অভিশপ্ত এই হিরে জগত বড় বেশি টেনে ধরেছিল রবিকে। তাই বুঝি এমন মন্দ ভাগ্য কৃষ্ণমেঘ রচনা করে গেছে ওর বিবাহিত জীবনে। মনে হয় বুঝি এক কল্পিত নাটক, যার মধ্যে সত্যের ছিটেফোঁটাও নেই। নিছক মিথ্যানৃত্য নিয়ে বুঝি রচনা করতে বসেছি এই কাহিনি।

কিন্তু তা তো নয়। হে পাঠক, হে পাঠিকা, বিশ্বাস করুন, এই আপাত আজব কাহিনি অলীক নয়। রতি পরিমাণেও। শিহরণ যদি জাগ্রত হয়, জানবেন তার মূলে আছে নিখাদ সত্য…এবং তা অবিশ্বাস্য।

হিরে নিয়ে, হিরের জন্মকথা নিয়ে শ্বাসরোধী ঘটনামালা সাজিয়ে যাওয়ার পরেই পকেট থেকে একটা পেপার প্যাকেট বের করে আমার সামনে রেখেছিল হিরে বণিক রবি রে। আদতে হিরে বণিক—মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ তার বহিরাবরণ। ছদ্মবেশ। বড় খলিফা…বড় ধুরন্ধর এই রবি রে।

পেপার প্যাকেটটা আমার সামনে রেখে দ্রিমি দ্রিমি মন্থর স্বরে রবি বলেছিল, ইন্দ্র, অ্যাংগোলায় যারা হিরে খুঁজে বের করে, এদের বলা হয় গ্যারিমপিরোস। জাতে এরা পর্তুগিজ। একদিন মোলাকাত ঘটল এমনই এক গ্যারিমপিরোসের সঙ্গে। পরনে টি-শার্ট আর জিনস। এই যে পেপার প্যাকেটটা তোর সামনে রাখলাম, এটা পেয়েছিলাম তার কাছেই।

প্যাকেট খুলে বের করেছিল একটা হিরের দানা-মুরগিকে যে দানা খেতে দেওয়া হয়—সাইজে চেহারায় সেইরকম।

এই দ্যাখ। বলে, পেপার প্যাকেট খুলে হিরের দানাটা আমাকে দেখিয়েছিল রবি রে। চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেছিলাম আমি।

রবি আমার নিথর চক্ষু তারকার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে গেছিল—ইন্দ্র, ছোট্ট এই পাথরটার ওজন সাড়ে তিন ক্যারাট। আদতে হিরে কিনা, তা যাচাই করার জন্যে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল টেন পাওয়ার ম্যাগনিফাইং গ্লাস–হিরে বাণিজ্যে যে জিনিসটা অপরিহার্য। হিরে চিনতে হলে, বিশেষ এই আতস কাচ দরকার ‘ আমি সেই কাচের মধ্যে দিয়ে যা দেখেছিলাম, তা আমার চক্ষু চড়কগাছ কবার পক্ষে যথেষ্ট।

আমি বলেছিলাম, রবি, তুই তো একটা পয়মাল। সহজে তাজ্জব হোস না। কি দেখেছিলি?

দেখেছিলাম দুটো হিরে গায়ে গায়ে জুড়ে রয়েছে। গলে গিয়ে জুড়ে গেছে। ধরণী তার জঠরের কল্পনাতীত তাপ দিয়ে দুটো দু’রকমের হিরেদের একসঙ্গে জুড়ে রেখে দিয়েছে।

আজ, এতদিন পরে, সেই কাহিনি লিখতে বসে আমার মনে হচ্ছে, রবি যেন ওর ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেছিল সেই যমজ হিরের মধ্যে। দুটো দুরকমের হিরে। একটা ও নিজে, আর একটা ওর ভাগ্যাকাশের শনি নক্ষত্র-কল্পনা।

রোমন থাক। সেদিনের কথায় আসি।

রবি বলে গেছিল—যমজ হিরে নিয়ে শুরু হয়েছিল দর কষাকষি! খনি শ্রমিক গ্যারিমপিয়োস যে হিরে বণিকের সামনে যমজ হিরে দেখিয়েছিল, তার নাম কাবেনজেলি। ছোট্ট একটা পকেট ক্যালকুলেটর বের করে সে খুটখাট করে হিরের দাম ফুটিয়ে তুলেছিল স্ক্রীনে। সাড়ে সাতশ ডলার। টেবিলের ওপর দিয়ে ক্যালকুলেটর ঠেলে দিয়েছিল হিরে যে খুঁড়ে তুলেছে—তার দিকে। সে দাম চেয়েছিল ২২০০ ডলার। ক্যালকুলেটর যাতায়াত করেছে টেবিলের এদিক থেকে ওদিকে। ওদিক থেকে এদিকে। দাম উঠেছে পড়েছে নিঃশব্দে—মুখে কোনও কথা নেই। শেষ পর্যন্ত রফা হয়েছিল ১৬০০ ডলারে। যমজ হিরে আমার পকেটে এল ২০০০ ডলারের বিনিময়ে। মস্ত ঝুঁকি নিলাম। হিরে ব্যবসাতে আজ যে রাজা, কাল সে ফকির হয়ে যেতে পারে, ফকির হয়ে যেতে পারে রাজা।

রবির চোখে চোখ রেখে আমি বলেছিলাম, তুই কি হয়েছিস?

যমজ হিরেকে পকেটে চালান করতে করতে রবি বলেছিল, এই মুহূর্তে রাজা। কেন না, ডবল দামের খদ্দের এসে গেছে হাতে।

বেরসিকের মতো আমি বলে ফেলেছিলাম, রবি, হিরে নিয়ে তুই কি শুধু দালালিই করেছিস? খনি থেকে হিরে তোলা দেখিসনি?

অট্টহেসে রবি তখন বলে গেছিল ওর দুর্ধর্ষ জীবনের অনেক গুপ্ত কাহিনি। যে সব কাহিনি প্রকাশ্য হলে ওর জীবন বিপন্ন হতে পারে। হিরে তোলার জাহাজে চেপে ও পাড়ি দিয়েছে মরুভূমির উপকূল থেকে আঠারো মাইল দূরের সমুদ্রে। সেই মরুভূমির নাম নামিবিয়া। দেখেছে কীভাবে সতেরো ফুট চওড়া ড্রিল ঢুকে যাচ্ছে দক্ষিণ আটলান্টিকের তিনশো ফুট গভীরে। টেনে তুলছে প্রতি ঘণ্টায় তিনশো মেট্রিক টন সমুদ্রতল—একটানা-বিরামবিহীনভাবে—দিনে আর রাতে-সাতদিন, সাতৃরাত।

ভাসমান খনি? নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলেছিলাম আমি।

হ্যাঁরে! গত দশ কোটি বছরে অরেঞ্জ নদী কত হিরে ধুইয়ে নামিয়েছে সাগরের জলে, তার একটা হিসেব করে নেওয়া হয়েছিল আগেই—পরিসংখ্যান হিসেব। সেই হিসেবেই ভাসমান খনি ভেসেছিল সাগরের জলে মাসে উনিশ হাজার ক্যারাটের হিরে তোলার টার্গেট নিয়ে…

উনিশ হাজার ক্যারাট!

আজ্ঞে।

হিরের ঝলকানি চোখ ঝলসে দেয়নি?

দূর! হিরে তো দেখিনি।

তবে?

শুধু পাথর আর সাগরের জঞ্জাল!

০৮. লরি বোঝাই হিরে

০৮. লরি বোঝাই হিরে

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা আমার কোষ্ঠীতে লেখা নেই। আমি যে ইন্দ্রনাথ রুদ্র! চমক দিয়ে যাই, নিজে চমকাই না। কিন্তু সেইদিন, বন্ধুবর রবি রে'র অতি অদ্ভুত জীবন কাহিনি শুনতে শুনতে বিষম চমক খেয়েছিলাম।

বলে কি রবি! সাগর গর্ভ থেকে স্রেফ জঞ্জাল তুলেছে হিরে তুলতে গিয়ে! বিপুল অর্থ ব্যয় করে! বলেছিলাম, নুড়ির মধ্যে থেকে হিরে খুঁজতে?

ও বলেছিল, সত্যিই তাই। ইন্দ্র। আমরা এই ঘরকুনো তাস, দাবা, পাশা বিলাসী বঙ্গতনয়রা এই জাতীয় অ্যাডভেঞ্চারাস সওদাগরি ভেঞ্চার কল্পনাতেও আনতে পারব না–

প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আমি বলেছিলাম, এই বাংলার বণিকরা একদা সপ্ত ডিঙা ভাসিয়ে সপ্তদ্বীপে বাণিজ্য করেছে—

সে সব দিন গেছে। এইভাবে হিরে তোলার ভাসমান খনি ভাসিয়েছিল কিনা জানা নেই। কিন্তু আমি যে সেই অ্যাডভেঞ্চারের পিপাসা নিয়েই দেখতে গেছিলাম। হিরে চিরকাল রমণী নয়নে মোহ বিস্তার করেছে, আমি সেই হিরে নিয়ে মেতেছিলাম…।

একটু বাগড়া দিয়েছিলাম, কল্পনার কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে?

কথাটা বলেছিলাম কিঞ্চিৎ হাস্য সহকারে। হাস্য বিবিধ প্রকারের হয়–এক চিলতে হাসি দিয়ে হাজার কথা বলে ফেলা যায়-মুখে উচ্চারণ না করে হাসি-বিজ্ঞানের এই তত্ত্ব রসিক পাঠক এবং সুরসিকা পাঠিকার অজ্ঞাত নয়।

আমার বহু অর্থব্যঞ্জক টিপ্পনি যেন কানেই তুলল না চৌকস রবি রে। বললে, রমণীগণ মুগ্ধ হন বলেই তো পুরুষ মহাশয়রা জীবন বিপন্ন করে সাগর ঘেঁচে আব পাতাল খুঁজে হিরে খুঁড়ে, হিরে খুঁজে বেড়ান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হা-কল্পনা আমাকে ইন্সপায়ার করে গেছে। তাই অত ঝুঁকি নিয়েছিলাম। কল্পনার কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো কাণ্ড করে গেছিলাম। সেটা শুধু হিরের লোভে নয়, টাকার খোঁজে নয়—

জানি, কণ্ঠস্বর থেকে পরিহাসকে নির্বাসন দিয়ে শুধিয়েছিলাম, কল্পনার মনের পটে হিরে নয়, হিরে নক্ষত্র হতে। সে কথা থাক। প্রেম পুরুষমাত্রকেই ভেড়া বানায়। তাই আমি ওই বস্তুটাকে পরিহার করি। কিন্তু এবার বল, সাগর ঘেঁচা জঞ্জাল নিয়ে কী করা হলো?

লরিতে তোলা হলো। পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের জড়োয়া-জঞ্জাল।

আমি ইন্দ্রনাথ রুদ্র, মূক থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলাম সেই মুহূর্তে এক বিলিয়ন মানে মিলিয়ন মিলিয়ন। এক মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ। কত লক্ষ, কত কোটি মুদ্রা মূল্যের জঞ্জাল নিয়ে লরি বোঝাই করা হয়েছিল, বিপুল বেগে মস্তিষ্ক চালনা করতে করতে সেই হিসেব করবার ব্যর্থ প্রয়াসে নিমগ্ন হয়েছিলাম। বিশেষ করে হিসেব এবং অঙ্কশাস্ত্রে আমি যখন নেহাতই কাঁচা।

আমার মুখভাব নিশ্চয় বিহ্বল আকার ধারণ করেছিল। রবি রে তা অবলোকন করে বিলক্ষণ প্রীত হয়েছিল। সহাস্যে বলে গেছিল, ইন্দ্র, হিরে নামক পাথরটা পাথর-হৃদয় ললনাদের প্রাণাধিক প্রিয় দোস্ত হতে পারে, কিন্তু হিরে ব্যবসায়ীরা ওই কুহাকে ভোলে না। তারা চলে সরল পাটিগণিতের হিসেবে। প্রতি বছর পৃথিবীর বুক খুঁড়ে তোলা হয় একশো কুড়ি মিলিয়ন ক্যারাট ওজনের আকাটা হিরে। রাফ ডায়মণ্ড।

একটু থ' হলাম। কিন্তু মুখে সেই ব্যঞ্জনা আনলাম না। সপ্রতিভ স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কত টন বল, মাথায় ঢুকবে।

চব্বিশ টন।

এবার ঢোঁক গেলার প্রবল ইচ্ছেটাকে প্রবলতর সংযম সহকারে সামলে নিয়ে বললাম, চব্বিশ টন! হিরে!

আজ্ঞে! যা ধরে যায় একটা মাত্র ট্রাকে। এক ট্রাক হিরে-জঞ্জাল বিক্রি হয় কিন্তু মাত্র সাত বিলিয়ন ডলারে। যে জঞ্জাল তুলতে খরচ হয়েছে দু'বিলিয়ন ডলার বেচে লাভ হয় পাঁচ বিলিয়ন ডলার। লাভের অঙ্কটা কী মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো নয়?

আমি, চৌকস নামে পরিচিত এই ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ভ্যাবাচাকা ভাবটাকে ম্যানেজ করে নিয়ে বলেছিলাম সপ্রতিভ স্বরে, খদ্দেরদের কাছে, মানে, হিরে-চোখো মেয়েগুলোর কাছে এই হিরে যখন ঝকঝকে চকচকে হয়ে গিয়ে পৌঁছয়, তখন কামায় কত ডলার?

বেশি না, মুচকি হেসে বলেছিল রবি রে, পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার। অলঙ্কার-টলঙ্কারে সেটিং হয়ে যাওয়ার পর।

এইবার আমার মাথা ঘুরে গেছিল। বুরবক মেয়েগুলোর জন্যেই চলছে হিরে নিয়ে এলাহি কারবার। এক লরি হিরের জঞ্জাল মেয়েদের মানিব্যাগ থেকে বের করে আনছে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার।

মাই গড!

০৯. কালাহারি মরুভূমির হিরের খনি

০৯. কালাহারি মরুভূমির হিরের খনি

বিচিত্র এবং অতীব বিস্ময়কর এই হীরক আখ্যায়িক পঠন নিরত অবস্থায় গৃহলক্ষ্মীরা অবশ্যই ভ্র-কুঞ্চন এবং বিবিধ আপত্তিকর মন্তব্যের সমাহার ঘটিয়ে চলেছেন। কাহিনির পত্তন ঘটেছিল কল্পনা চিটনিসের পুত্র অপহরণ দিয়ে... অপহৃত সেই বালকের পুণরুদ্ধার কাহিনির মধ্যে না গিয়ে বেরসিক এই ইন্দ্রনাথ রুদ্র সহসা হীরক-অবর্তে ঘূর্ণমান হচ্ছে কেন—নাসিকাকুঞ্চন সহকারে এইটাই তো অভিযোগ?

বিশ্বের বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই একটি পরম সত্যে অবহিত থাকেন। মা লক্ষীরা বড় ধৈর্যহীনা। ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা—এই তিন মহাগুণ থেকে এ বপিত। ঈশ্বর ইভ সৃষ্টিকালে ধরণীর প্রথম রমণীকে বহুবিধ রঞ্জণী বস্তু দিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন—কিন্তু ভূলক্রমেই হোক বা ইচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই হোক—এই মহাগুণত্রয়ের সন্নিবেশ ঘটাননি জিন গঠনে।

আমি টের পাচ্ছি, আমার এই লতায় পাতায় পল্লবিত কাহিনি পড়তে পড়তে এই এঁরা বিবিধ প্রকার ভ্রূ-ভঙ্গিমা দেখিয়ে চলেছেন এবং সরস বঙ্কিম কটুক্তি বর্ষণ করে চলেছেন।

কিন্তু হে মা-বোনেরা, আমি নিরুপায়। এ যে ভর পাওয়া কাহিনি। হিরের আত্মা ভর করেছে আমার এই লেখনীতে। হিরে নিয়েই তো যত বিভ্রাট এই দুনিয়ায়। সেই প্রহেলিকাই প্রভঞ্জন আকারে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ভাঙা কলমটাকে। আপনারা স্বচ্ছন্দবোধ করুন, এই আমার মিনতি, কল্পনা চিটনিসের বিচ্ছু পুত্রের প্রসঙ্গে ফিরে আসব যথাসময়ে...।

রবি রে বললে আমার দিকে অপাঙ্গচাহনি নিক্ষেপ করে, ইন্দ্র, তুই অ্যাডভেঞ্চারিস্ট, কিন্তু কালাহারি মরুভূমিতে হিরে খোঁজের অ্যাডভেঞ্চারে অবশ্যই যাসনি। ঠিক বলছি?

আমি অনুক্ষণ সময় ব্যয় না করে বলেছিলাম, না যাইনি। তুই গেছিস?

শ্রীযুক্ত রবি রে তখন শুরু করেছিল অত্যাশ্চর্য সেই উপাখ্যান-ইন্দ্র, পেশোয়ারের পাথরের কথা তোকে একটু আগেই বলছিলাম। এই প্রসঙ্গে পরে তোকে আরও কিছু বলব। এখন শুধু জেনে রাখ, হিরের বাজারে দর তোলবার জন্যে হিরে-কারবারিরা মাঝে মাঝে হিরে লুকিয়ে রাখে…কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে… কোল্ডস্টোরেজে সবজি রেখে দেওয়ার কায়দায়…পেশোয়ারের সেই বন্ধ্যা অঞ্চলে পাহাড় দিয়ে ঘেরা পাহাড়ি দুর্গের গোপন ধনাগারে এইভাবেই হিরে জমানো থাকে। যেমন থাকে এই পৃথিবীর আরও কয়েকটা জায়গায়…নামগুলো। পরে শুনিস।

কল্পনা…কল্পনা আমাকে ওর চোখের হিরের জাদু দিয়ে টেনে এনেছিল এই লাইনে। কল্পনা সুন্দরী ওর একটু চাপা আর টানা ছোট চোখের জন্য…নাক মুখ ঠোঁট সবই ডানাকাটা পরীদের মতো…আশ্চর্য…এত লাবণ্য আর কোনও মেয়ের মুখে তো দেখিনি…তা ওর চাহনি…হিপনোটিক. সত্যিই সম্মোহনী। ঠাট্টা করে আমাকে একদিন বলেছিল, কামরূপের মেয়ে আমার মা, বিয়ে করেছিল। ইস্পাহানের বাবাকে…জন্মেছি আমি সিকিমের মাটিতে…তাই আমি সিকিমি মেয়ে…গ্যাংটকের রূপসী…ওগো আমার প্রিয়…আমার আসল রূপ কোথায় জান? এই চোখে .এই চোখে…এই চোখে…আমি যে ত্রাটক যোগে যোগিনী… মায়ের কাছে রপ্ত করা এই গুপ্ত বিদ্যার বলে আমি বশে আনতে পারি মনের মতো মানুষকে…তুমি থাকবে চিরকাল আমার পাশে…আমার এই চোখের। টানে… মদনের বান যে আমার এই চোখ!

ইন্দ্র, কল্পনার চোখের চাহনির মধ্যে সত্যিই অসাধারণ কিছু আছে। এাটক যোগ কী বিদ্যা জানতে চেয়েছিলাম। হেসে গড়িয়ে পড়ে কল্পনা বলেছিল, সেকালের মুনিঋষিরা বনের পশুদেরও বশে রাখত মনের যে শক্তি দিয়ে…চোখের যে চাহনি দিয়ে…ত্রাটক যোগ অভ্যেসে তা এসে যায়। আমার অসমিয়া মা আমাকে তাই শিখিয়েছে…তাই তোমার মতো বুনো আমার চোখের টানে বাধা পড়েছ…প্রিয়তম রবি, তুমিই এখন সূর্য আমার এই জগতে, আমি তোমার গ্রহ…

আমি বলেছিলাম, গ্রহ না, গ্রহণী।

কল্পনার বাংলা জ্ঞান তেমন উত্তম নয়। জাদু চোখ নাচিয়ে বলেছিল, তা তো বটেই…তা তো বটেই…মেয়ে গ্রহরা তো গ্রহণীই হবে।

বেচারা কল্পনা! ঠাট্টাও বোঝেনি। আমিও বোঝাইনি। গ্রহণী যে একটা উদরাময় রোগ, ক্ষুদ্রান্ত্রের ব্যায়রাম, তা ও জানবে কী করে? আমি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, শারীরস্থান রপ্ত করেছি…আমি জানি।

এই পর্যন্ত শুনে, কল্পনা-সঙ্গীত শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে আমি, শ্রী ইন্দ্রনাথ রুদ্র বলেছিলাম, কী মুশকিল! হচ্ছিল হিরে কাহিনি, চলে এল খণ্ডকাব্যকল্পনা… কল্পনা…কল্পনা!

তখন কি জানতাম, খণ্ডপ্রলয়ের আভাস পেয়েছিলাম সব কিছুর নিয়ামক নিয়তির নিয়মে!

কল্পনার ইস্পাহানি চোখ আর নাক-ঠোঁটের বাঙালিয়ানা মাদকতা প্রসঙ্গে আসবো পরে। কঠিন ঠাঁই এই ইন্দ্রনাথ রুদ্র যে অনেক গভীর জলের মাছ… আরাবল্লী-বিদ্যাধরী-গন্ধর্ব কন্যারাও বঁড়শিতে গাঁথতে পারেনি যাকে…সে ছিল কি মতলবে?

ইন্দ্রনাথ রুদ্র যখন মতলববাজ হয়, তখন সে রূপময় পাঁকাল!

কিন্তু কল্পনা যে আমার কলমে ভর করেছে। ঘুরে ফিরে কল্পনা কাহিনি চলে আসছে কলমের ডগায়! ওর ওই চোখ আর নাক-ঠোঁট-চিবুকের গঠনের মধ্যে যে জাদুকরী মিশেল আছে, তা আমার রহস্যসন্ধানী চক্ষু যুগলের মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে ঔৎসুক্য সঞ্চার করে গেছে বরাবর। আমি মানব প্রত্নবিদ নই, তবে সাংস্কৃতিক নৃবিদ্যা নিয়ে মস্তিষ্কচর্চা না করে পারি না মানুষের মুখ, করোটি আর শরীরের গঠন দেখলেই! তাই কল্পনার চোখ নাক চিবুক হনু আমার মনে ঔৎসুক্য জাগিয়েছিল। যার মুখাকৃতির মধ্যে বংশছবি বিধৃত রয়েছে এরকমভাবে, তার পদবি চিটনিস কেন?

চিটনিস তো ষোলআনা সিকিমি পদবি। তাহলে?

আমার গোয়েন্দা কৌতূহল মিটিয়ে দিয়েছিল কল্পনা নিজেই। ওর বাবা ইস্পাহানি যাযাবর, মা অসমিয়া—কামরূপ কন্যা। বিয়ে-থা করে নিবাস রচনা করেছিল সিকিমে; কিন্তু পদবি পাল্টে নিয়েছিল। কেউ কারও পদবীকে প্রাধান্য দেয়নি। নতুন রূপের নতুন মানুষ এই কন্যা মিশে যাক সিকিমি সংস্কৃতিতে। তবে, রক্তে বহন করুক ইস্পাহানি উদ্দামতা আর কামরূপী ছলনা…ললনাদের যা সহজাত।

ঘুরে ফিরে কল্পনা প্রসঙ্গ চলে আসছে কাহিনির মধ্যে। সব সঙ্গীতের মূল সুর যেমন একটাই থাকে, বিষম বিচিত্র এই কাহিনির মূল সুরও যে কল্পনা। হিরের ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি-কল্পনা যার নাম। সুন্দরী, তুমি শুকতারা!

কিন্তু আমার মাথায় কালাহারি মরুভূমিতে হিরের খোঁজে যাওয়ার কাহিনি-বীজ বপন করে দিয়েই উদ্দাম গুরের সেই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি যেন ঘোরের মাথায় বলে গেছিল বন্ধুবর রবি রে।

ফিকে সবুজ পাথরের পাহাড় উঁচিয়ে দু'পাশে! মাঝে কঙ্কর-আকীর্ণ পথ। যদিও পথ তাকে বলা যায় না। নেচে নেচে ট্রাক চলেছে এই পথে। খনিজ সম্পদের ম্যানেজার মহাভি রয়েছে রবির সঙ্গে। ট্রাক ঢুকছে বিবর পথে—চলেছে বিবরের একদম তলার দিকে। এই বিবরেরনাম জবানেঙ্গ-কালাহারি মরুভূমির বোটসওয়ানা অঞ্চলের একদম শেষের অঞ্চল। হিরের খনি রয়েছে এইখানেই। ধরণীর সবচেয়ে রমণীয় ভূ-সম্পত্তি এই অঞ্চল। ধূসর মরু তার ভয়াবহতা দিয়ে আগলে রেখেছিল হাজার হাজার বছর ধরে। এখন তার গোপন দ্বার দু'হাট হয়ে গেছে হিরে-সন্ধানীদের উৎপাতে।

কিমবারলাইট ঠাসা একটা শিরা পাওয়া গেছিল এখানে ১৯৭৩ সালে। পাইয়ে দিয়েছিল ধরণীর নিকৃষ্টতম এক পোকা। উইপোকা।

১০. হিরে খনির পাহারাদার উইপোকা

১০. হিরে খনির পাহারাদার উইপোকা

হ্যাঁ, নিছক উইপোকা। তাদের চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়া নেই। কিন্তু নিশ্চয় অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে, নইলে পাথরের মতো কঠিন কংক্রিট ভেদ করে খুঁজে খুঁজে ঠিক পুস্তক নামক সম্পদের সন্ধান পায় কী করে?

আমি, ইন্দ্রনাথ রুদ্র, বিষমভাবে ললনা-বৈরাগী। তাই আমাকে টলানো যায় না। এমনকী কল্পনার মতো কুহকিনীও আমার মনের আকাশে আর ধমনীর প্রবাহে সুনামি-নৃত্য জাগাতে পারেনি তার কামনা জাগানো চাহনি দিয়ে, তার সবুজ চোখের সেক্সি দ্যুতি দিয়ে, তার পোর্সিলেন প্রতিম ত্রিবর্ণ দিয়ে, সবার ওপরে—তার নিখুঁত ছাঁদের সঠিক স্থানের উচ্চাবচ দেহরেখা দিয়ে…।

ঘুরে ফিরে কল্পনা চলে এল উইপোকা কাহিনি বলতে গিয়ে। কেন এল? হে পাঠক এবং পাঠিকা, সর্বত্র সঞ্চার করবার ক্ষমতা আপনাদের আছে, আপনারা। অবশ্যই অবহিত হয়ে গেছেন অকস্মাৎ মনের কোণ থেকে কল্পনা কেন বেরিয়ে এল উইপোকারা মাথার মধ্যে কিলবিল করে উঠতেই?

হ্যাঁ, মশায় হ্যাঁ, উইদের মতোই ওর যেন একটা অতীন্দ্রিয় নয়ন আছে। কার পিছনে ওর ওই সবুজ চোখের দ্যুতি লেলিয়ে দিলে হীরকদ্যুতির খনি-খোঁজ পাওয়া যাবে, ও তা জানে। এটা ওর একটা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। তাই ঠিক বেছে বেছে, বহু প্রলুব্ধ পুরুষকে বাতিল করে পাকড়াও করেছিল রবি রে'কে…

রবি রে…হির পাগল রবি রে…উইপোকাদের সাম্রাজ্য যে অতুলনীয় হীরক-ভাণ্ডার মানুষের ধারণার বাইরে রেখে দেওয়ার জন্যে, সে খবর সঠিক সময়ে এসে গেছিল ওর কাছে…।

শুধু কি উই...কঙ্করাকীর্ণ সেই পার্বত্য এলাকায় থুক খুক করছে অস্ত্র পাহাড়ি কঁকড়া বিছে...তারা লুকিয়ে থাকে পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে...কিন্তু পিল পিল করে বেরিয়ে আসে মানুষের গন্ধ পেলেই আনেক...অনেক বছর আগে পেশোয়ারের পাষণ্ডরা প্রাণদণ্ড দিতে গ্রহণ করেছিল এহেন নিষ্ঠুর উল্লাসের পন্থা...গর্দান না নিয়ে শুধু গর্দান আর মুণ্ডটুকু বের করে রেখে বাকি শরীরটা পুঁতে রাখত মাটির মধ্যে... পিল পিল করে ধেয়ে যেত লোহিত বর্ণের বিভীষিকা জাগানো কঁকড়া বিছে...

বীভৎসর বর্ণনায় আর যেতে চাই না। ফিরে আসা যাক উইপোকা রক্ষিত হীরক ভাণ্ডারের রোমাঞ্চ জাগানো কাহিনিতে।

ফিকে সবুজ রঙের পাথর-পাঁচিল মাথা তুলে খাড়া ছিল পথের দু'পাশে...পাহাড় দুর্গের এমন রঙের প্রাচীর স্বয়ং প্রকৃতি নির্মাণ করে রেখেছে যুগ যুগ ধরে...রবি রে আর মাহী বেঞ্জামিনের ট্রাক নাচতে নাচতে ধেয়ে যাচ্ছিল এহেন উপল সমাকীর্ণ পথের ওপর দিয়ে...

মাহী এই অভিযানের পথপ্রদর্শক এবং নেতা। তার একটা গালভরা পদও আছে —মিনারেল রিসোর্স ম্যানেজার...সরল বাংলায় যার অর্থ-রত্নসম্পদ ম্যানেজার। খনিজ সম্পদ বললে যথার্থ হয়। কিন্তু এ খনিতে আছে যে শুধু রত্ন।

রবি রে'র সঙ্গে তার দোস্তি যে সব কারণে, তার সবিস্তার বর্ণনা এ কাহিনিতে নিষ্প্রয়োজন—অতএব তা উহ্য থাকুক।

ওরা চলেছে জবানেঙ্গ রত্ন-গহ্বরের একদম তলদেশ অভিমুখে। হ্যাঁ, ধরণীর সবচেয়ে মূল্যবান রত্নময় খনি এই জবানেঙ্গ খনি। যার ভাণ্ডারে থরে থরে সঞ্চিত রয়েছে অতুলনীয় হীরক সম্পদ-মা-পৃথিবী বানিয়েছেন বহু সংহারক তাণ্ডবলীলার মাধ্যমে...সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছেন নিজের গভীর গোপন জঠরে...

কিন্তু ধূর্ত মানুষ সন্ধান পেয়েছে সেই জঠর-গহ্বরের, উইয়ের দৌলতে...অযুত নিযুত বছর ধরে ছোট ছোট ডালিম দানার মতো বজ্র মণিদের জুড়ে জুড়ে বৃহৎ সুবৃহৎ প্রকাণ্ড মণি বানিয়েছেন প্রকৃতি-জহুরি, লোহা-টাইটানিয়াম-অক্সিজেনের

সমাহারে নির্মাণ করে গেছেন কৃষ্ণকায় খনিজ পাথর ইলমেনাইট-যে সবের মধ্যে গেঁথে চোখে লুকিয়ে রেখেছেন হিরে…হিরে…হিরে…পুঁতে রেখেছেন একশো বিশ ফুট গভীরের বালি আর পাথরের মধ্যে…লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা কল্পনাতীত সেই ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের দিকে ধেয়ে চলেছে হীরক-অন্বেষীদের এই ট্রাক…

হীরক উত্তোলন অতিশয় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ফি বছরে নব্বই বিলিয়ন ডলারের অধিক অর্থ ব্যয় করে যেতে হয় এই খনির পিছনে। এই খনি, সেই সঙ্গে আবও দু'টো খনির সন্ধান পাওয়া গেছে প্রথম কিমবারলাইট পাইপ আবিষ্কৃত হওয়ার পর… ১৯৭৩ সালে…তারপর থেকেই আফ্রিকার মানুষদের কপাল ফিরে গেছে… তাদের জীবনযাপনের মান এখন চোখ টাটানোর মতো।

স্রেফ হীরক ভাণ্ডারের দৌলতে! হিরে-নিহিত আগ্নেয়-পাথর কিমবারলাইট সেই ভাণ্ডার…হীরক ভাণ্ডার…দক্ষিণ আফ্রিকার কিমবারলি অঞ্চলে যে হীরক শিরার আবিষ্কার ঘটে সর্বপ্রথম।

ট্রাক থেকে নেমে খনির তলদেশে পৌঁছে স্তম্ভিত হয়ে গেছিল রবি রে—

অবিরাম বিস্ময়ের চোটপাট আঘাতে যে কি না বিস্ময় কি বস্তু, তা একেবারেই ভুলে মেরে দিয়েছিল। গহ্বরের দেওয়াল হাজার ফুট উঠে গিয়ে ছাদ নির্মাণ করেছে অনেক উঁচুতে। হেঁট হয়ে মেঝে পরখ করবার অছিলায় যখন বুট জুতোর ফিতে বাঁধছিল রবি রে, মাহী গর্জে উঠেছে কানের কাছে—খবরদার! মেঝেতে হাত দেবেন না।

কেন? ধরণী স্পর্শ তে নিষিদ্ধ নয় কোনও দেশেই?

মানুষ মাত্রই একদিন না একদিন ধরণীর ধুলোয় মিশে যায়, তাহলে ধরণী স্পর্শ নিষিদ্ধ হতে যাবে কেন?

প্রশ্নটা রবি রে'র দুই চোখে নৃত্য করে ওঠার আগেই 'কেন'র উত্তর জুগিয়ে গেছিল হীরক-প্রহরীদের সর্দার মাহী বেঞ্জামিন।

পাথরের এই সমুদ্রে এক পিস হিরে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। পঞ্চাশ লক্ষ পিস সমান সাইজের নুড়ি ঘাঁটলে পাবে এক পিস হিরে। তা সত্ত্বেও সিকিউরিটি বড়

সজাগ। রিমোট ক্যামেরা নজর রাখছে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে। আসবার সময়ে তোমাকে যতটা সার্চ করা হয়েছে, এখান থেকে বেরোনোর সময়ে তার চেয়ে বহুগুণ সার্চিংয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এক রতি হিরে নিয়েও এ তল্লাট থেকে বেরোনোর হিম্মৎ কারও নেই। পুরো কমপ্লেক্সটাকে কিভাবে উঁচু বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে, তা তো নিজের চোখেই দেখে এলে আসবার সময়ে।

হেঁয়ালির ঢঙে বলেছিল রবি রে, কেন, বন্ধু, কেন? অনেক সিকিউরিটি পেরিয়ে এলাম-চোর যে নই, ওপরওলা তা জানে। তবে কেন এত অবিশ্বাস, এত অপমান?

কারণ, হিরে পেলেই মানুষ মাত্রই তা কাছে রাখে। এই স্বভাব রয়েছে যে প্রতিটি মানুষের মধ্যে। হিরে হাতছাড়া কেউ করে না…কেউ করে না।

রবি রে কি তা জানে না? হিরের টানকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে হিরের দামকে আকাশছোঁয়া করে দিয়ে–দামের এহেন উত্থান কিন্তু সম্পূর্ণ তৈরি করা। আসল দাম যা হওয়া উচিত, নকল দাম তার চেয়ে ঢের বেশি করে রাখা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে—হীরক বাণিজ্যের ঘুঘু বণিকরা জানে, কীভাবে হিরে লোভীদের চক্ষু চড়কগাছ করে দিয়ে টাক থেকে টাকা খসিয়ে আনতে হয়।

এবং সেটা হয় কিভাবে?

ডিম্যাণ্ড আর সাপ্লাইয়ের মধ্যে ফারাক রেখে দিয়ে। যে জিনিস যত কম পাওয়া যায়, সেই জিনিসের জন্যে মন বেশি লালায়িত হয়। সিম্পল থিওরি।

রবি রে কি তা জানে না? হিরে বাণিজ্যের অবিশ্বাস্য কেনাবেচার খবর-টবর নিয়েই তো অনেক কলকাঠি নেড়ে ঢুকতে পেরেছে পাতাল প্রদেশের এই হীরক ভাণ্ডারে। খনি থেকে তোলা হিরের থলি রাখা হয় মাত্র একশো পঁচিশ জন হীরক-সওদাগরের সামনে। তামাম দুনিয়া ঘেঁচে বেছে নেওয়া হয় এই একশো পঁচিশজনকে–অনেক রকমভাবে হুঁশিয়ার হয়ে। হিরে বেচা আর আলু-পটল বেচা, এক জিনিস নয়। হিরে যে বেচবে, সে খুঁটিয়ে খবর নেয় হিরে যে কিনবে–তার সম্পর্কে। তারপর, তাদের জড়ো করা হয় বছরে একবার—দু'জায়গায়-লণ্ডনে আর জোহান্নে সবার্গে। তারপর, হলুদ রঙের একটা প্লাস্টিক ব্রিফকেস আনা হয় তাদের সামনে, যার মধ্যে থাকে একটা প্লাস্টিক জিপ ব্যাগ। হিরে ভর্তি। আকাটা হিরে।

উপুড় করে দেওয়া হয় একশো পঁচিশ জোড়া হীরক চক্ষুর সামনে। হিরে দেখে তারা নয়ন সার্থক করবে, মনে মনে দাম যাচাই করে নেবে, কিন্তু মুখে দাম হাঁকতে পারবে না। কেনাবেচার হাটে এ-এক কিম্ভুত ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার অন্যথা হয়নি আজও।

কী সেই ব্যবস্থা?

দাম হাঁকবে হিরের মালিক। খনি ছেচে হিরে তুলে এনেছে যে, সে। হিরে নিতে হবে সেই দামেই। দরদামের কারবার নেই। নিতে হয় নাও, নইলে যাও! এই নিয়ম শিথিল হয় শুধু একটি ক্ষেত্রে। বড় হিরের ক্ষেত্রে। যে হীরক-খণ্ডদের ওজন ১০.৮ ক্যারাটের চেয়ে বেশি।

থ' হয়ে শুনছিলাম হীরক-বাণিজ্যের থরথর কাহিনি। সকৌতুকে আমার মুখপানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হিরে-ধারালো গলায় বলেছিল রবি রে, কি রে ইন্দ্র, চোখ যে ছানাবড়া করে ফেললি!

স্রষ্টানামক ভদ্রলোক আমার চোখেও নাকি দু'খণ্ড কমল হিরে বসিয়ে দিয়েছেন- আমাকে নিয়ে আবোল-তাবোল গল্প লেখবার সময়ে বন্ধুর মৃগাঙ্ক প্রায়শ সেই উপমা টেনে আনে। আর, ওর বউ, দাপুটে কবিতা বউদি, তো যখন-তখন পিছনে লাগে আমার এই হিরে চোখের জন্যে। বলে, জলুস দিয়ে। মেয়ে টানা হচ্ছে, আবার যাচাই করাও হচ্ছে-কাচ, না, পাথর!

আমি, সেই ইন্দ্রনাথ রুদ্র, মূক হয়ে রইলাম হীরক সওদাগরি বৃত্তান্ত শুনে।

তারপর, বোধহয় মিনমিন করেই, জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু এই প্রথা যারা ভঙ্গ করে? হেঁকে হেঁকে দাম তোলে?

একশো পঁচিশ জনকে একসঙ্গে না ডেকে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। এক-একজনকে ডেকে নিজের জিনিস বেচা অন্যায় তো নয়।

ইন্দ্র, হীরক বাণিজ্যে সেটা ঘোরতর অন্যায়। অলিখিত এই কানুন যে ভাঙে, অতিলোভী সেই হীরক-সওদাগরের কপালে লেখা থাকে অনেক শাস্তি।

কীভাবে?

হাতে মেরে নয়, ভাতে মেরে।

কীভাবে? কীভাবে? সেটা হয় কীভাবে?

একটা পন্থা হলো, বাছাই করা হিরের স্রোতে বাজার ভাসিয়ে দিয়ে।

যাতে দর ভোলা হিরের দর পড়ে যায়?

হ্যাঁ, বন্ধু, হ্যাঁ। অভিনব পন্থা। হিরের দাম ফেলে দিয়ে হিরে লোভীর সর্বনাশ করে দেওয়া।

থ' হয়ে গেছিলাম শাস্তি দেওয়ার পন্থা-প্রকরণ শুনে। হিরে একটা সর্বনাশা পাথর। হিরের মধ্যে আছে ধরিত্রীর অভিশাপ। আমার মূল কাহিনি তার প্রমাণ। কলম ধরেছি তো সেই কথা বলবার জন্যেই।

অনিক্স পাথরের ডিমের মধ্যে ছিল সেই অভিশাপ। যে অভিশাপকে টেনে এনেছিল সবুজ চক্ষু কল্পনা চিটনিস। গায়েব হয়েছিল তার চোখের মণি-পেটের ছেলে–সোমনাথ।

বাজারে হিরে পাথরের ঢল নামিয়ে দাম ফেলে দেওয়ার ফিকির আমাকে চমৎকৃত করেছিল বিলক্ষণ। তাই প্রশ্নাকারে ঔৎসুক্য ঠিকরে এসেছিল মুখ দিয়ে

রবি, এত হিরে আসত কোত্থেকে? কার হিরের গুদাম থেকে?

ঈষৎ হাস্য করে জবাব দিয়েছিল রবি—ডি বিয়ার্স নামক এক হীরক বণিকের কিংবদন্তীসম একটা হিরের গুদোম আছে লণ্ডনের হেড কোয়ার্টারে। কখনও-সখনও হিরের ঢল নামানো হতো এই গুদাম থেকে বাছাই করা হিরের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হতো হীরক-মার্কেট—কেঁপে যেত দুনিয়া।

শুধু একটা গুদোম থেকে? আমতা আমতা করেছিলাম আমি—তা কি করে হয়? লণ্ডনের এত ক্ষমতা?

ইন্দ্র, ইংরেজরা জাত বণিক! বণিকে মানদণ্ড—

ছেঁদো কথা রাখ। প্রতিদ্বন্দ্বী দড়ায়নি? পালটা হিরে গুদোম?

পয়েন্টে চলে এসেছিস। হ্যাঁ, দাঁড়িয়েছে–কালক্রমে। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া কানাডায়। বিশেষ করে ইজরায়েলের এক জহুরি-চক্র তাসখন্দ থেকে হিরে-ভেলকি দেখিয়ে কোণঠাসা করে এনেছে লণ্ডনের হিরে জাদুকরদের। রুশ হিরের নিয়ন্ত্রণ এখন তাসখন্দের মুঠোয়।

রবি, আমার মস্তক ঘূর্ণিত হচ্ছে।

বেচারা বাঙালি। গোয়েন্দাগিরিই তোর দৌড়। হিরে-দৌড়ে পাল্লা দেওয়া তোর কম্মো নয়। মাই ডিয়াব ডিটেকটিভ, হিবের সঙ্গে সোনা আর রূপোর কোনও তুলনাই হয় না। বাজার এক্কেবারে আলাদা। এক দামে হিলে কিনে সেই জহুরির কাছেই সেই একই দামে হিরে বেচা যায় না, জহুরি তার প্রফিট রাখবেই। সোনার দোকানে ঝোলে দৈনিক সোনার দাম, দৈনিক হিরের দাম ঝোলে না কোথাও। সেই দাম থাকে হুরির পেটের মধ্যে। ঝোপ বুঝে কোপ মারে। হিরে সেই কারণেই স্রেফ অমূল্য।

অ-মূল্য!

আজ্ঞে। ইরান বিপ্লবের দুঃসময়ে মুহূর্তের নোটিশে দেশ ছেড়ে পয়াকার দেওয়ার সময়ে এক ব্যক্তি কি করেছিলেন? বাড়ি বিক্রি করবার সময়ও পাননি, ব্যাঙ্কে যাওয়ার সময়ও ছিল না—সঙ্গে নিয়েছিলেন শুধু পাথর ভর্তি ব্যাগ।

হিরে পাথর?

হ্যাঁ। যার দাম তিরিশ মিলিয়ন ডলার।

আমি নির্বাক থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলাম। তিরিশ মিলিয়ন ডলার মানে যে কত কোটি রজত মুদ্রা, সে হিসেব সেই মুহূর্তে ভোঁ ভোঁ মাথায় আসেনি।

আমার হতভম্ব মুখভাব তারিয়ে তারিয়ে নিরীক্ষণ করে নিয়ে মুচকি হেসে বলেছিল হিরে-ধুরন্ধর রবি রে, হিরে এক রকমের কারেন্সি। পত্রমুদ্রা, মানে নোট, রজতমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রার মতো হিরেও একটা মুদ্রা। এ মুদ্রার দাম নির্দিষ্ট হয় জহুরির চাতুরির দৌলতে-গভর্নমেন্টের কোনও হাত নেই হিরের দাম বেঁধে দেওয়ার। হে বন্ধু, তাই মনে রেখ, যার হিরে আছে, তার সব আছে। দুনিয়া তার মুঠোয়।

ইণ্টারন্যাশনাল কর্জ, দেনা শোধ, ঘুষ দেওয়া, অস্ত্রশস্ত্র কেনা—এই ধরনের বহু ব্যাপারে অন্য যে-কোনও মুদ্রার চেয়ে বেশি কাজ দেয় হিরে-মুদ্রা।

আমার চক্ষুযুগল নিশ্চয় বিলক্ষণ বিস্ফারিত হয়ে গেছিল হীরক-কীর্তন শুনতে শুনতে। দুই মণিকায় কৌতুক নৃত্য জাগ্রত করে বিষম আমোদে তা নিরীক্ষণ করে যাচ্ছিল হিরে পাটোয়ার রবি রে।

কিন্তু রবি চলে ডালে ডালে, আমি চলি শিরায় শিরায়। মৃগাঙ্ক লিখিত মদীয় কাহিনি সমুচয়ে নিশ্চয় আমার এই মূল মস্তিষ্ক ক্ষমতাটা যথাযোগ্যভাবে উপস্থাপিত হয়ে এসেছে। যতই ছাইপাশ লিখুক না কেন মৃগাঙ্ক, চরিত্রের মূল সুর ও ঠিক ধরতে পারে। আমি যে কি মাল, তা কিন্তু জানা ছিল না রবি রে'র কথার স্রোতে ওকে ভাসিয়ে রেখে, কিছুমাত্র বুঝতে না দিয়ে, কথার উপলখণ্ডে ঠোক্কর খাইয়ে নিয়ে এসেছি এমন একটা বিন্দুতে, যা এই হিরে নিয়ে তথ্যভিত্তিক রহস্য কাহিনির মূল উপপাদ্য…

কেন্দ্রবিন্দু।

আমতা আমতা ঢঙে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রবি, আমি আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবর রাখি না।

সবেগে মস্তিষ্ক চালনা করে রবি বলেছিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তোর মুরোদ এই বেঙ্গলে-যত্তোসব ছিচকে কেস নিয়ে মস্তানি দেখিয়ে–

নিমেষে চলে এলাম সার কথায়। বললাম, ভিজে বেড়ালের মতো, একট। গুজব কানে এসেছে, উদ্ভট গুজব…স্রেফ গুজব…পাকা খবর নয়…আনকনফার্মড রিপোর্ট।

ঝেড়ে কাশলেই তো হয়। তেলাচ্ছিস কেন?

চতুর এবং চতুর্মুখ রবি রে বুঝতেই পারেনি ওটা আমার অভিনয়। সাধে কি কবিতা বউদি আমার পেছনে লাগে। মিনমিন করে বলেছিলাম, পাছে অপযশ করা হয়ে যায়, তাই কাউকে বলতে পারি না…সাংবাদিকদের কানেও কথাটা গেছে কি না জানি না…

অসহিষ্ণু স্বরে বলেছিল রবি রে, কথাটা কী?

ইয়ে, মানে, ওসামা বিন লাদেনের টেররিস্ট অরগানাইজেশন–

আল কায়েদা?

হ্যাঁ, হা, এরা নাকি এই অপারেশনে আছে? ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের মার্চ, ২০০২ সংখ্যার ২০ পৃষ্ঠায় ২০ এই সংবাদের আভাষ দেওয়া হয়েছে।

অমনি সতর্ক হয়ে গেছিল বকমবাজ রবি রে। ওম হয়েছিল মিনিটখানেক। তারপর বলেছিল হুঁশিয়ার স্বরে—ইন্দ্র, তুই আদার ব্যাপারি, আমি হিরের ব্যাপারি—ওষুধের জগত থেকে হিরের জগতে চলে এসেছি স্রেফ জ্ঞানবান হওয়ার জন্যে…যে জ্ঞান আখেরে কাজ দেবে…কিন্তু গুপ্ত সংগঠনের ব্যাপার-ট্যাপার—

গুপ্তই থাকুক, ঝটিতি বলেছিলাম আমি। কেন না আমার যা জানবার, তা জানা হয়ে গেছিল।

১১. আট লাখ হিরে শ্রমিকের দেশ—এই ভারত

১১. আট লাখ হিরে শ্রমিকের দেশ—এই ভারত

উইপোকা আর লাল কাঁকড়া বিছে পাহারা দিয়ে চলেছে হিরের যে খনি অঞ্চল, তা নিয়ে আরও কথা বলতে ভুলেই গেছিল কুশলী বক্তা রবি রে। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ লাইনটাই তো বকমবাজদের লাইন-আজকাল অবশ্য মেয়েরাও এই লাইনে লাইন দিয়ে নামছে। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাম-টামও করে ফেলেছে। কেন না, সুধী ব্যক্তি মাত্রই জানেন, ঈশ্বর মহোদর নারীজাতিকে জিহ্বা সঞ্চালনের ক্ষমতা কিঞ্চিৎ অধিক দিয়েছেন, সেই সঙ্গে দিয়েছেন কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা। বুদ্ধিমত্তার ক্ষিপ্রতা এর সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় দশভুজা হতে পারে শুধু তারাই…

যাচ্চলে, আবার কল্পনা-কাহিনিতে চলে আসছি নাকি? যত নষ্টের গোড়া অবশ্য সেই সবুজময়না—কিন্তু তার আগে আরও কিছু বলে নেওয়া যাক…, যা-যা জেনেছিলাম মহা ডানপিটে রবি রে'র পেট থেকে…

হিরের খনির ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে হেঁট হয়েছিল বলে ধমক খেয়েছিল রবি রে। তারপর কি হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে আর না গিয়ে চলে এসেছিল এই পৃথিবীর ডায়মণ্ড বাজারে হৃৎপিণ্ড যেখানে, সেইখানে-অ্যান্টওয়ার্প রেলরোড স্টেশনের পাশের তিনটে রাস্তায়-কালাহারির কথা আধাখাচড়া রেখে দিয়ে এমন একটা জায়গায়—হিরে যেখানে উড়ছে। খনি থেকে তোলা এবড়ো-খেবড়ো অতিশয় অসুন্দর। হিরেদের শতকরা আশিভাগের লেনদেন হচ্ছে সরু সরু তিনটে রাস্তায় আর এই বিশাল হিরে বাজারের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের অন্য অন্য শহরেও।

আমি প্রকৃতই জ্ঞান বুভুক্ষুর মতো জানতে চেয়েছিলাম, রবি, সে শহরগুলো কোথায় রে?

নিউইয়র্কে, লণ্ডনে, তেল আভিভে, আর বোম্বাইতে।

বোম্বাইতে!

অপেরা হাউস ডিসট্রিক্টে কখনও যাসনি?

সেটা কোথায়?

বোম্বাইতে।

বম্বে যে একটা ডায়মণ্ড সিটি, আমার তা অজানা ছিল না। এত বুক নয় এই ইন্দ্রনাথ রুদ্র। বম্বে একা এখন আর ডায়মণ্ড সিটি নয়, এই গৌরব ছড়িয়ে পড়েছে ইণ্ডিয়ার অন্য অন্য শহরেও।

যেমন, ব্যাঙ্গালোরে।

ব্যাঙ্গালোরের সুনাম অনেক দিক দিয়ে। ছিল গার্ডেন সিটি, হল আইটি সিটি, এখন শুতে চলেছে ডায়মণ্ড সিটি…শুধু একজনের উদ্যমে। তার নাম শ্রীযুক্ত রবি রে। এত লম্বা কাহিনি সেই কাহিনিরই ভূমিকা।

রবি অনেকদিন ধরেই স্বপ্ন দেখেছিল, এই পৃথিবীর সেরা সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, ভারতকে আবার সেই রত্নময় ভারতের জায়গায় নিয়ে যাবে।

বাঙালির ব্রেন যখন খেপে ওঠে, তখন সে পারে না, এমন কিছু নেই। ওষুধ বিক্রির সুযোগকে হাতিয়ার করে ও ঢুকে গেছিল হিরের জগতে…এই ভারতের হীরক দুনিয়ায়…যে দুনিয়ায় আট লাখ শ্রমিক নানা শহরে বসে আকাটা হিরে কেটেকুটে খাসা হিরে বানিয়ে চলেছে…সাইজে এক ক্যারাটের কম হলেও ঝকমকে হিরের কণা বের করেছে…রমণীর নাকের জেল্লা বাড়িয়ে দিচ্ছে…ফলে, শুধু নাক নেড়েই কেল্লা মেরে দিচ্ছে মেয়েরা। ‘

মূলে রয়েছে আট লাখ হিরে কারিগর!

আমি হাঁ হয়ে গেছিলাম রবিব হিম্মৎ কাহিনি শুনে। কি অসাধারণ বুকের পাটা। যে বাজারে গুজব ভাসছে হাওয়ায়, যেখানে হিরের দাম ঠিক হয়ে যায় শুধু চোখের ইশারা আর একটি মাত্র হিব্রু শব্দ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে, সেই বাজারে বাংলার ছেলে জাঁকিয়ে বসেছিল শুধু ব্রেন আর ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে।

আমি আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হিব্রু শব্দটা কী রে?

মজল।

মা-মানে?

গুড লাক।

সিক্রেট শব্দটা ডায়মণ্ডের সমতুল্য। একটু-আধটু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে, ডায়মণ্ড মহোদয়রা কক্ষনো জানতে দেয় না কোন ডায়মণ্ড কোন খনিতে আবির্ভূত হয়েছিল। চেহারা দেখে চেনা যায় না। কোন মুলুকের মাল। চেহারা দেখে চরিত্র বুঝতে হবে-জন্মস্থান জানা যাবে না। পাকেও তো পদ্ম ফোটে।

রবি রে ওর ডায়মণ্ড চক্ষুর নৃত্য দেখিয়ে বলেছিল, মাই ডিয়ার ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ওই যে একটা কথা আছে না, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা ন জানন্তি, ডায়মণ্ডদের ক্ষেত্রে কথাটা খাটে। জলুস দেখে কেউ বলতে পারবে না–কোন মুলুকের মাল। তুই তো সূত্রান্বেষী ইন্দ্রনাথ রুদ্র–

ক্ষীণ স্বরে বলেছিলাম, মৃগাঙ্ক থাকলে তোর এই বিশেষণটা লুফে নিত।

বাগড়া পেয়ে থমকে গিয়ে চোখ পাকিয়ে রবি বলেছিল, কোন বিশেষণটা?

সুত্রান্বেষী। একদা আমাকে ছিদ্রান্বেষী বিশেষণ দিয়ে একখানা জম্পেস গল্প বানিয়েছিল। সূত্রান্বেষী…সূত্রান্বেষী…গুড অ্যাডজেক্টিভ।

বিরক্ত হয়েছিল রবি। এটা আমার ইচ্ছাকৃত। কথার টানা স্রোতকে হঠাৎ হঠাৎ ঘুলিয়ে দিতে হয়। আচমকা আচমকা বাগড়া পড়লে অনেক অনিচ্ছার কথা ফুসফাস করে বেরিয়ে আসে। চতুর পাঠক এবং চতুরা পাঠিকা, আপনারা এই টেকনিক বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে দেখতে পারেন। রতিপতির বাণ যখন মানব মনকে শিথিল করে দেয়, তখন এইভাবে আলটপকা ঢিল মেরে দেখতে

পারেন-অনেক কদর্য কাহিনি বেরিয়ে এলেও আসতে পারে। এই জগতের যারা মাতাহারি, তারা জানে এই গুপ্ত কৌশল। জানে কল্পনা চিটনিস…।

যাচ্চলে, ঘুরে ফিরে সবুজনয়না ফের চলে এসেছে লেখনী অগ্রে…

এবার টেনে কলম চালাচ্ছি। শী বলছিলাম? ও হ্যাঁ, হিরে দেখে অতি ওস্তাদ জহুরিও বলতে পারে না, ধরণীর কোন খনন ভূমিতে ঝিকিমিকি পাথরটির প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে। আদিভূমি অজানা থেকে গেলেও হিরের টুকরোর সার্টিফিকেট দিতে কসুর করে না ডায়মণ্ড এক্সপার্টরা। লক্ষ কোটি হিরে-পাথর এই মুহূর্তে পাইপলাইন দিয়ে স্রোতের আকারে বয়ে চলেছে, অথচ তাদের প্রত্যেকেই উৎসবিহীন। এবড়ো-খেবড়ো আকৃতি ঝেড়ে ফেলে ঝকঝকে চকমকে হয়ে উঠছে, কিন্তু কোনমতেই জানতে দিচ্ছে না ধরণীর কোন কোণ থেকে তারা এসেছে।

উৎস অজানা, কিন্তু ঔৎসুক্য কারোরই কম থাকেনি। অ-রূপ পাথরটাকে রূপময় করে তোলার ব্যাপারে। সার্টিফিকেট না পেলে বুনো পাথরে দাম চড়বে কী করে? স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো রবি বলে গেছিল এবড়ো-খেবড়ো অতি কদাকার একখানা পাথরকে মেজে ঘষে কেটে কুটে কীভাবে ৫৮ দিকওয়া হিরে বানানো হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য ওর হয়েছিল নিউইয়র্কে—মানহাট্টান ডিসট্রিক্টের ঠিক মাঝখানে—কড়া পাহাবায় রাখা ওয়ার্ক রুমে এক অপরাহ্নে। হিরে কারিগর ঘুরিয়ে যাচ্ছিল একটা চাকা–পুরনো দিনের গানের রেকর্ড গ্রামোফোনের ওপর বাই বাই করে ঘুরত যেভাবে—সেইভাবে। ঘুরন্ত চাকায় তেল আর হীরক-চূর্ণের আস্তরণ…কুমোরের চাকা ঘুরছে বলে মনে হয়েছিল রবির…বাংলার ছেলে তো…হিরে-কারিগরের সঙ্গে কুমোরের মিল খুঁজে পেয়েছিল মনের মধ্যে…মিল থাকার কারণও ছিল যথেষ্ট…এক তাল মাটিকে যেমন টিপে টুপে মূর্তির অবয়ব ইত্যাদি এনে দেয় কুমোর, প্রায় সেই একই পন্থায় হিরে-কারিগর আকাটা হিরেকে কেটেকুটে খাসা হিরে বানাচ্ছে…একপাশের ফ্ল্যাম্পে আটকানো রয়েছে অধরা হিরে…দু'মাস ধরে সাজাচ্ছে বদখৎ বৃহৎ হীরকখণ্ডকে—খনি থেকে যখন এসেছিল কাটাই-ঘরে, তখন সেই হিরে ছিল অস্বচ্ছ, অর্ধ-আয়তাকার একটা চাই…একপ্রান্ত আর এক প্রান্তের চেয়ে থ্যাবড়া…

অস্বচ্ছ? এই পর্যন্ত শুনে আমি মুখ খুলে ফেলেছিলাম, হিরে আবার অস্বচ্ছ হয় নাকি?

হয় বন্ধু, হয়। ভেতরের ত্রুটি চেপে রেখে দেওয়ার জন্যেই হীরকজননী সন্তানতুল্য হিরেকে ঈষৎ ধোঁয়াটে রেখে দেয়।

ধোঁয়াটে হিরে!

আজ্ঞে। মনে হয় যেন এক তাল কুয়াশা জমাট হয়ে রয়েছে ভেতরে। ঘুরন্ত সেই হিরোকে কয়েক মিনিট অন্তর চোখের সামনে তুলে ধরে অন্তর্ভেদী চোখে চেয়ে থাকে হিরে-কাটিয়ে…আমি যাকে দেখেছি, এ ব্যাপারে তার মতো ওস্তাদ খুবই কম আছে এই দুনিয়ায়…তিরিশ বছর ধরে শুধু হিরে কাটছে…কাটছে…কাটছে। যে হিরেটাকে দেখেছিলাম গ্রামোফোন ডিস্কের মতো চাকার ওপর ঘুরতে, সেটার পিছনে লেগেছিল মাস দেড়েক…একখানা হিরে কাটতে দেড় মাস।

বিড় বিড় করে বলেছিলাম, সাধারণ হিরে নিশ্চয় নয়।

একেবারেই নয়। সত্যিই অসাধারণ। জীবনে এমন হিরে আমি দেখিনি, ইন্দ্র। আর আমাকে তা দেখানোর জন্যে, আমার চোখ তৈরি করার জন্যে—দেওয়া হয়েছিল দুর্লভ এই সুযোগ।

যোগ্য বলেই প্রশংসাটা করেছিলাম অন্তর থেকে। রবি রে অকারণে রবি রশ্মি হয়নি। হীরক রশ্মির জগতে ও দুম করে চলে আসেনি। জীবন বিপন্ন করে দেখেছে, অন্তরশক্তিকে জাগ্রত করেছে-তবেই না, অধুনা ব্যাঙ্গালোরের ডায়মণ্ড কমপ্লেক্সের জনক হতে পেরেছে। হৃদয়জাত শক্তি দিয়ে চিনেছে পৃথীজাত পাথরকে…

কিন্তু চিনতে পারেনি ত্রাটক যোগসিদ্ধা কল্পনা চিটনিসকে।

দম নিয়ে ফের শুরু করেছিল রাব—এই যে দিনের পর দিন একটা মাত্র হিরে পাথরকে অনবরত মেজে ঘষে কেটেকুটে যাওয়া,এর মধ্যে আসল আর্টটা কি জানিস?

অপচয় যাতে কম হয়, আলটপকা বলে দিয়েছিলাম আমি।

দ্যাটস রাইট; খুশি উপচে পড়া চোখে বলেছিল রবি রে, কাটতে গিয়ে, পালিশ করতে গিয়ে যেন বেশি হিরে ধুলো হয়ে না যায়—

টুক করে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেই ধুলো থেকে কি হিরে ভস্ম তৈরি হয়?

হিরে ভস্ম!

যা খেয়ে নাকি নবাব-বাদশারা হারেম ম্যানেজ করে যেত।

স্টুপিড! হচ্ছে হিরে-কথা, চলে গেল হারেমে। ইন্দ্র, তোর মতিগতি বিশুদ্ধ নয়

নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

সেকেণ্ডে কয়েক ব্যাজার থাকবার পর ঝেড়ে উঠল রবি। বললে, ইদ্র, যে হিরেটাকে সেদিন রিভলভিং স্টেজে নেচে নেচে কাটাই হতে দেখেছিলাম, মামুনি হিরে সেটা নয়। একখানা পাথরে আটান্নটা দিক-এক-একদিকে এক-রকম জলুস। সে যে রোশনাই, না দেখলে তুই ধারণায় আনতে পারবি না।

আনতে চাইও না। তুই বলে যা।

জুল জুল করে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল রবি। চোখে চোখে কথা যখন হল না, অর্থাৎ আমার হিরে-নিরেট মাথায় যখন ওর মনের কথা জাগ্রত হল না, তখন বাচন আকারে যে কথাটা বলেছিল রবি, তা এই–

ইন্দ্র, হিরেটা সাইজে ঠিক একটা ডিমের মতো।

অশ্বডিম্বের মতো নয় নিশ্চয়।

নিতান্ত অসময়ে নেহাৎই অপ্রাসঙ্গিক এইরকম অনেক রসিক আমি করে ফেলি। বাক্য বীরাঙ্গনা কবিতা বউদি তখন আমার ওপর তেড়ে ওঠে। হে সুবুদ্ধি পাঠক এবং হে জ্ঞানবতী পাঠিকা, আপনারা দয়া করে সেই ইচ্ছা সম্বরণ করুন। কথার খই অনেক সময়ে খেই ধরিয়ে দেয়।

রবি একটু বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু হীরক-উপাখ্যানে নিমগ্ন থাকার ফলে তা নিমেষে কাটিয়েও উঠেছিল। বলেছিল, ডিম। হিরের ডিম। হিরে-ইতিহাসে এমন অতিকায় ডিম আর জন্মায়নি।

বলতে বলতে স্মৃতির কুয়াশার আবিল হয়ে গেছিল হীরক উপাধ্যায় রবি রে।

আমি ওর ঘোর কাটানোর জন্যে আলতোভাবে বলেছিলাম, অজ্ঞর অজ্ঞতা ক্ষমাঘেন্না করে একটা প্রশ্নের জবাব দিবি?

প্রশ্নটা যে রকম, জবাবটা সেই রকম হবে।

তেড়ে উঠছে দেখে, আলতোভাবে পেশ করেছিলাম কৌতূহলটা, হিরে কি চেঁচায়?

অদ্ভুত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রবি। তারপর বললে, সত্যিই তুই ভাল গোয়েন্দা।

থ্যাঙ্কস ফর দ্য সার্টিফিকেট। কিন্তু…হিরে কি চেঁচায়?

হ্যাঁ, চেঁচায়…মাঝে মাঝে…কাটাই করার সময়ে। জননীর জঠর থেকে বেরিয়ে এসে শিশু যেমন কেঁদে ওঠে, হিরে তেমনি কাঁদে…রূপান্তর ঘটানোর সময়ে।

অ, বলে নিশ্চুপ রইলাম সেকেণ্ড কয়েক।

আর একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম তারপরেই—হিরে কি খানখান হয়ে যেতে পারে বেমক্কা ঠোক্করে?

বিপুল বিস্ময়ে চেয়ে রইল রবি। বললে তারপরে, আঁচ করলি কী করে? হিরে তো কঠিনতম পদার্থ এই পৃথিবীতে…হিরেকে ভাঙা যায় না—এইটাই তো সবাই জানে। ইন্দ্র, তুই একটা জিনিয়াস। হ্যাঁ, হিরেও খান খান হয়ে যেতে পারে—বেঠিক জায়গায় ঠোক্কর খেলে।

হিরে কঠিন মানুষদের মতো—আমি দার্শনিক হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

হীরকপ্রতীম রবি রে কিন্তু দর্শন-ফর্শনের ধার ধারে না। বললে, এই জন্যেই একজন ঘুরন্ত চাকার নিচে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে। হিরে হাত ফসকে গেলে যেন। মাটিতে না আছড়ে পড়ে—লুফে নিতে পারে তার আগেই।

মুখখানাকে বোক চন্দরের মতো করে আমি জানতে চেয়েছিলাম, মস্ত হিরেকে কি কেটে খানকয়েক করা হয়েছিল?

হ্যাঁ…হ্যাঁ…তেড়াবেঁকা ছিল যে আকাটা হিরে।

ক’টা হিরে বেরিয়েছিল?

ছটা।

ছ’টা! খনির হিরের মূল ওজন তাহলে ছিল কত?

দু’শ পঁয়ষট্টি দশমিক বিরাশি ক্যারাট।

পেল্লায় হিরে যে। ডায়মণ্ড মার্কেট কাঁপানো হিরে। বন্ধু, এবার বল তো, এ হিরে কোথাকার হিরে?

কঙ্গোর হিরে।

এই আখ্যায়িকার নামকরণে একটু ভুল করেছি। নাম রাখা উচিত ছিল ‘হিরের ডিম’।

তবে হ্যাঁ, ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগে পাঠক এবং পাঠিকা নিশ্চয় আঁচ করে ফেলেছেন, অনিক্স পাথরের ডিমের সঙ্গে হিরের ডিমের কোথায় যেন একটা মিল আছে।

সবুর…সধুর…আর একটু।

১২. হিরেময় বিগ্রহ-বালাজি

১২. হিরেময় বিগ্রহ-বালাজি

হিরের মধ্যে আছে কসমিক পাওয়ার—অলৌকিক শক্তি—এই বিশ্বাসের বনেদের ওপর গড়ে উঠেছিল এই ভারতের হিরে বিগ্রহ…হিরের দখল নিয়েই রক্তক্ষয়ী লড়াই লেগেছে রাজ্যে রাজ্যে, হিরের লোভেই ছুটে এসেছে লোলুপ বিদেশিরা।

এইসব বৃত্তান্ত আমার কিছু কিছু জানা ছিল, পুরোটা জানতাম না। শুধু বুঝেছিলাম সব অনর্থ এবং অকল্পনীয় আর অভিশপ্ত অর্থ ভাণ্ডারের মূলে রয়েছে হিরে। এবং, একদা এই ভারত ছিল হিরের মূল উৎস।

কঙ্গোর হিরের গল্প শুনতে চেয়েছিলাম রবির কাছে। জানতে চেয়েছিলাম ওষুধের সাম্রাজ্য ছেড়ে কেন এল সে হিরের মার্কেটে। তখন হিরে প্রোজ্জ্বল চোখে আবিষ্ট স্বরে হিরে-ইতিহান শুনিয়েছিল আমাকে—এই রবি রে…

হিরে নাকি সৌভাগ্যের প্রতীক? তবে কেন ঘনিয়ে এল এমন কালো মেঘ তার ভাগ্যাকাশে?

আমি…ইন্দ্রনাথ রুদ্র…শরীরের প্রতিটি রক্তকণিকা দিয়ে বিশ্বাস করি, হিরে একটা ঘণীভূত রক্তঝঞ্ঝা ছাড়া কিসসু নয়…

কিন্তু সেই কথা টেনে শেষ করে দিতে চাই…স্বপ্নিল চোখে যেসব কথা দুর্মদ রবি রে সেদিন আমাকে বলে গেছিল। ওর জীবনের নিবিড় তমসার সঙ্গে হয়তো সেই কাহিনীর কোথাও না কোথাও সংযুক্তি আছে…নাও থাকতে পারে…কিন্তু ঝড়ের বেগে হিরে ইতিহাস শুনিয়ে আমাকে যেভাবে বিহ্বল চমকিত বিমূঢ় কবে তুলেছিল রবি রে…তার কিছুটা অন্তত না লিখে যে পারছি না…একটা অদৃশ্য শক্তি আমার কলম টেনে ধরে লিখিয়ে নিচ্ছে…আমি চাইছি না সবুজাভ নয়না কল্পনা

চিটনিসের কিডন্যাপড পুত্রের কাহিনির অবতারণা ঘটিয়ে হীরক-উপাখ্যানে আসতে…কিন্তু রুখতে পারছি না…আমার সে শক্তি নেই…কিছু একটা আমার কলমকে ভর করেছে.আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচ্ছে, লিখতে আমাকে হাবেই… লিখতে আমাকে হবেই…যা শুনেছি, বর্ণে বর্ণে তা লিখে যেতে হবে…রবি রে'র জবানিতে।

রবি বলছে—

ইন্দ্র, আমি নাকি বেঁকা চোখের এক বক্রমানব? এমন বিশেষণ জীবনে প্রথম শুনেছিলাম কল্পনার কণ্ঠে। অথচ আমাকে অতিমানব রূপে মন মঞ্জিলের অন্দরমহলে ঠাঁই দিয়েছে এই কল্পনা। কেন? আমার চেহারার বর্ণনায় হয়তো ও কিছুটা অতিরঞ্জন করেছে। এমনটাই হয়। তাই না? ভাবাবেগ যখন ভালবাসার আবেগে হোমকাষ্ঠ জুগিয়ে যায়, তখন মানুষমাত্রই সোজা চোখে না দেখে বঙ্কিম চোখে নিরীক্ষণ করে যায় নিজের নিজের মনের মানুষদের…নয়ন পাথের পথিক যখন মন পথের পথসাথী হয়ে ওঠে, ঠিক তখন…তাই না?

আমার চোখ…হ্যারে…আমার এই চোখ নাকি বিশ্বকর্মা বিশেষ পাথর কুঁদে বানিয়ে তবে আমার চক্ষুকোটরে সেট করেছেন। ইন্দ্র, তুইও দেখেছিস, আমার ভুরু দুটো সরল রেখায় নেই—দু'টো ভুরু ঢালু হয়ে নেমে গেছে দু'দিকে…ভুরু দু'টোর নিচে চোখের গড়ন দুটোও সেই রকমভাবে বানানো হয়েছে…দুটো চোখই একটু ঢালু—দু'প্রান্তে। যা দেখে কল্পনা আমাকে বলত, তোমার চোখে মেয়ে টেঁকে না…গড়িয়ে পড়ে যায়!

কী কথা! চোখের ঢালু গড়ন আমার মনকে তো ঢালু করেনি। এ মন যে কি মন, আজও তা বুঝে উঠলাম না। আমার বাইরের চেহারার সঙ্গে সমতা রেখে চলেছে এই মন। তাই তো হয়, তাই না রে, ইন্দ্র?

হ্যাঁ, আমার চেহারাটায় একটু পাঠান-পাঠান ভাব আছে। হয়তো আগের জন্মে আমি পাঠান ছিলাম। কাবুল কান্দাহার আফগানিস্তান ইরান-টিরানে রক্তঝা তুলেছিলাম। আমার নাক চোখা, আমার বাটালি চিবুক সামান্য সামনে ঠেলে থাকে, আমার গালের হনু-হাড় একটু উঁচু-তার নিচে সদা জাগ্রত থাকে দুটো খোদল, আমার চোয়াল রীতিমতো চৌকোণা আর মারকাটারি মার্কা, আমি লম্বায় পাক্কা ছ'ফুট, আমার শরীরে পেশি বেশি-চর্বি কম।

এক কথায়, আমাকে এক নজরে অভারতীয় মনে হয়। সেটাই আমার কর্মজীবনে প্লাস পয়েন্ট হয়ে দাড়িয়েছে। আমি এই ভাবালু বাঙালিদের মতো কবি-কৱি। নই—জিদও যোলআনা। তবে হ্যাঁ, বোগাস বাঙালি আমাকে বলা যায় না। বাঙালি যে কতখানি বেপরোয়া হতে পারে, তা বিজয় সিংহই শুধু দেখাননি, মহা রহস্যের নায়ক মহামতি সুভাষচন্দ্র বসুও দেখিয়েছেন…।

কিন্তু আমার একটা মহাদোষ আছে। আমি একটু বেশি বকি। ব্রাদার, এই কোয়ালিফিকেশন্টার জোরেই তো দাপিয়ে বেড়াচ্ছি মেডিক্যাল লাইনে…কথার ফুলঝুরি ঝরিয়ে যাই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত চিকিৎসক মহলে…তাদের ভেতর পর্যন্ত ধোলাই করে দিয়ে চালু করে দিই আমার প্রোডাক্ট…..

একটু ভুল বললাম। এখন আর দিই না। আগে দিতাম। এখন তো আমি হিরের জগতের তারকা…স্টার…তবে হ্যাঁ, গোটা ভারতবর্ষটার শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে টহল দেওয়ার সুযোগ তো পেয়েছিলাম এই প্রফেশনে এসে…

আর দেখে গেছিলাম আমার এই ঢালু চোখ দিয়ে…জেনেছিলাম হিরে নিয়ে কত কাণ্ডই না হয়ে গেছে এই ভারতে…এখন সেই কাণ্ড আর কারখানা ছড়িয়ে পড়েছে তামাম পৃথিবী গ্রহে!

লোকে বলে বটে, আখাম্বা চেহারা থাকলেই কি সব হয়, মাথায় ঘি থাকা চাই। আমার মাথায় ঘি আছে কি গোবর আছে, সেটা বিশ্বকর্মা জানেন। তবে আমার এই পাঠান-পাঠান চেহারাটা কাজ দিয়েছে অনেক। এই চওড়া কাঁধে, আমাদের লেখক বন্ধু মৃগাঙ্ক রায় কাঁধকে বৃষস্কন্ধ বলে—অর্থাৎ ষাঁড়ের কাঁধ। এই কাধে যখন মার্কিনি কার্স্টিংয়ের কোট ঝোলাই, তখন আমাকে মার্কিন মুলুকের মানুষ বলেই মনে হয়। তার ওপর ম্যারিকান ঢঙে ইংরেজি বলার কায়দা। ফলে, বিদেশি বাজারে পথ করে নিতে পেরেছি সহজে। এই ঢালু চোখ, এই উঁচু হনু, এই চওড়া কঁধ প্রশস্ত করে দিয়েছে আমার পথ।

হিরের জগতে প্রবেশ করেছিলাম স্রেফ জানবার তাগিদ নিয়ে। আমি সাউথ ইণ্ডিয়ার অনেকগুলো ভাষা গড় গড় করে বলে যেতে পারি। কোস্কানি, তামিলিয়ান, তেলেগু, কানাড়া, কেরালা বচন আমার জিভের ডগায়। তার ওপর এই ড্যাশিং পুশিং ফিগার। কেটে বেরিয়ে গেছি সর্বত্র।

হিরে আমাকে টেনেছিল অথবা বলতে পারিস, আমার টনক নড়িয়েছিল সর্বপ্রথম যেদিন বালাজির বিগ্রহ দেখেছিলাম। মঠ, মন্দির, মসজিদ, গির্জা আমাকে কস্মিনকালেও ভক্তি বিহ্বল করে তোলে না, তা তুই জানিস। বিধর্মী আমি সবার কাছেই। কিন্তু বচনে দর বলে পথ করে নিই সর্বত্র। এইভাবেই একদিন দর্শন করতে গেছিলাম তিরুপতির বালাজিকে—এত ভক্ত সমাগম কেন হয়, তার হেতু অন্বেষণ করতে।

ইন্দ্র, বালাজি বিগ্রহ দর্শন করে আমার এই বেঁকা চোখ ট্যারা হয়ে যায়নি, এই যথেষ্ট। ইন্দ্রনাথ রুদ, তুই নাকি বহু বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষ, লোকে তাই বলে, অবশ্য এহেন বচনসুধার পিছনে কলকাঠি নাড়ায় আমাদের লেখক বন্ধু মৃগাঙ্ক, ওর কলমকে যদি বাণিজ্যিক কলম বলি, তাহলে ও ক্ষেপে যায়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি কিঞ্চিৎ বাণিজ্য নির্ভর না হলে কোনও শিল্প এবং সাধনক্ষেত্র কালজয়ী হতে পারে না।

এটা আমার নিজস্ব জীবন দর্শন। আর এই কাঠখোট্টা একান্ত পার্থিব দর্শন নিয়ে বালাজির বিগ্রহ দর্শন করতে গেছিলাম।

হিরে পাথরটা নিছক পাথর নয়। এই পাথরের মধ্যে একটা অপার্থিব শক্তি নিহিত আছে, এমন কথা আমি অনেকদিন ধরে অনেকজনের কাছে শুনে আসছি। ব্যবসাবাজ-জহুরিরা এই প্রবাদের সঙ্গে আর একটা মাত্রা যোগ করেছে। হিরে নাকি প্রেম টেনে আনে, মনের মধ্যে হিরের খনির মতো ভালবাসার খনি বানিয়ে দেয়, বিপুল আবেগ সহজাত করে মনের মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। লাখো উপহারেও যা হয় না, এক কণা হিরে তা করতে পারে।

এটা কিন্তু জহুরিদের, হিরে ব্যবসায়ীদের একটা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি। হিরের দর তোলার ব্যবসায়িক চাল। তাই কথায় কথায় সব জহুরিই বলে, হিরে! সে তে চিরকালের! হিরে থাকলে সব থাকবে! হিরে স-ব টেনে ধরে রাখে!

ফলটা কি হয়েছে জানিস, ইন্দ্র–আমেরিকান, ইউরোপিয়ান জাপানিজ, ইনিজ মেয়েরা আরও বেশি করে হিবে বসানো আংটি কিনে পরিয়ে দিচ্ছে মনের মতো পুরুষদের আঙুলে…যুগ যুগ ধরে এই রীতিই যে চলে আসছে…মনের মানুষকে যদি পায়ের জুতো বানিয়ে রাখতে চাও,পরিয়ে দাও তার অনামিকায় হিরে গাঁথা একটা আংটি…অপার্থিব কুহেলি রচিত হবে সেই পুরুষের মনের অন্দরে কদরে…মনের আকাশ ছেয়ে যাবে একটিমাত্র রমণীর লালসা মদির মেঘপুঞ্জে।

জহুরিদের এই ব্যবসায়িক বুকনির পিছনে সত্যিই কি কোনও অপার্থিব শক্তির অস্তিত্ব আছে?

এই ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে খোঁচা মেরে চলেছিল অনেক…অনেকদিন ধরে! আমি একটু ইনকুইজিটিভ মাইণ্ডেড, অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী, তা তুই জানিস। হিরে নামক অতি-কঠিন একটা পাথরের সঙ্গে কিংবদন্তী জড়িত রয়েছে কেন যুগ যুগ ধরে, সেই গবেষণায় মন ঝুঁকে পড়েছিল বড় বেশি।

তাই ডুব মেরেছিলাম এই ভারতবর্ষের পৌরাণিক কাহিনি সাগরে। ইন্দ্র, আজব দেশ এই ভারতবর্ষ। এত পৌরাণিক সম্পদ তুই আর কোনও দেশে পাবি না। এ দেশের লোকগুলো আর কিছু না পারে, লিখতে পারে বটে। মাথা খাটিয়ে বিস্তর ব্যাপার লিখে একালের ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিকদেরও মুণ্ড ঘুরিয়ে দিচ্ছে। এখন বলা হচ্ছে,পুরাণের রূপকের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে বহু বৈজ্ঞানিক সত্য…দর্শন আর কিছুই নয়, এক এবং অদ্বিতীয় মহাবিজ্ঞানের ঈষৎ আভাস…

কী বলছিলাম? হ্যাঁ, ইণ্ডিয়ান পুরাণ। এখানে কিন্তু বলা হয়েছে, রত্নমাত্রই কসমিক পাওয়ার বিধৃত। ভাগ্য পরিবর্তনের সহায়ক বিশেষ বিশেষ রত্ন ধারনের পরামর্শ দিয়ে আসছেন জোতিষী মহাশয়রা সেই আদ্যিকাল থেকে আজ পর্যন্ত। বিষয়টা আমার কৌতূহলী মনকে খুচিয়ে গেছিল বলেই আমি গেছিলাম হায়দ্রাবাদে। বসেছিলাম এক জহরত দক্ষ জ্যোতিষীর সঙ্গে। তেলেগু ভাষাটায় যৎকিঞ্চিৎ দখল আছে বলেই তার ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলাম। শুনেছিলাম সেই একই কথা।

প্রেম এবং পরিণয়, সহবাস আর সন্তান উৎপাদন, এমনকী অমরত্ব এনে দেওয়ার ব্যাপারেও জহর মহাশয়দের অব্যাখ্যাত ভূমিকা রয়েছে।

হাসছিস? আমিও হেসেছিলাম—মনে মনে। জহর যদি অমর করে রাখতে পারে, তাহলে আওরঙ্গজেব প্রমুখ জগৎ কুখ্যাত মানুষগুলো আজও বেঁচে থাকত।

এই দ্যাখ! হিরের ঘোরে আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছি। ইন্দ্র, হিরে এমনই একটা বস্তু। সর্বনাশ করে! সর্বনাশ করে!

কিন্তু এই বিশ্বাসটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস—স্রেফ আমার। কারণ আমি কুসংস্কার মানি না। কিন্তু মানত সেকালের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মহাগুরুরা। ধর্মের সঙ্গে হিরে পাথরটা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, এ তত্ত্ব তারা মনে মনে বিশ্বাস

করত কি না জানি না, তবে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিল সাধারণ মানুষদের। তাই, আজও পিল পিল করে মানুষ ছুটে যায় মাদ্রাজের উত্তর-পশ্চিমের তিরুপতি পাহাড়ে-খানে রয়েছে সোনার পাতে মোড়া বালাজি বিগ্রহ। আগাগোড়া হীরক-আকীর্ণ প্রস্তর দেবতা।

আমি অবশ্য মুগ্ধ হয়ে চোখের পাতা না ফেলে চেয়েছিলাম নফুট হাইটের বিশাল সেই বিগ্রহের দিকে। নফুট হাইট কম কথা নয়, তার ওপর মিশমিশে কালো পাথর কুঁদে গড়া। একটা সরু গলিপথের শেষপ্রান্তে রাখা সেই বিগ্রহের দিকে একবার তাকালে আর চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না—এমনই আকর্ষণ তার। প্রতিবর্গ সেন্টিমিটারে। লক্ষ্য করেছিস, 'তার' বললাম? ভক্তি নিবেদন করলাম। কিছু একটা আছে ওই বিগ্রহর মধ্যে। তা নাহলে আজ আমি হীরক সাম্রাজ্যের একটা কেউকেটা হলাম কী করে!

আজকের ইণ্ডিয়ায় সবচেয়ে পপুলাব বিগ্রহ হতে চলেছে এই বালাজি। আমি চোখের পাতা ফেলতেও বোধহয় ভুলে গেছিলাম। আমার পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল...মাইল কয়েক লম্বা লাইনে...হাজার হাজার ভক্ত...প্রত্যেকের কণ্ঠের বালাজি বদনায় গলিপথ যেন ফেটে চৌচির হতে চাইছিল...থর থর করে কাঁপছিল ওপরে নিচে দু'পাশের পাথর... সেইসঙ্গে মিশেছিল ঝনঝন ঝনঝন ঝনঝন শব্দ...মেশিনের গজরানি...কেন? আরে বাবা, অত রেজকি... দর্শনার্থীদের চাঁদা...না... না...প্রণামী...মেশিন চলছে...বাছাই করে যাচ্ছে... বেগুলার বিজনেস...আওয়াজ হবে না? কান ফেটে যাওয়ার মতো কোলাইল! চাঁদা...ইয়ে, প্রণামী মিটিয়ে, তবে দেখতে হয় বালাজিকে। ধারে কারবার নেই। আশ্চর্য! গণতন্ত্রের দেশে এ কি জুলুম। পয়সা দিয়ে দেবতাকে দেখতে হবে?

যাকগে, হচ্ছিল হিরের কথা, এসে গেল পয়সার কথা। বালাজির মাথার মুকুটটার দিকে চেয়ে আমি চোখের পাতা ভুলে গেছিলাম নিশ্চয়। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। আগাগোড়া হিরে দিয়ে গড়া এমন মুকুট আমি জীবনে দেখিনি, দেখব বলেও মনে হয় না। ওজনে যাট পাউণ্ড...প্রায় তিরিশ কেজি...হিরের সংখ্যা কত জানিস? শুনলে মুণ্ডু ঘুরে যাবে। আঠাশ হাজার।

১৩. হিরের শঙ্খ, হিরের চক্র

১৩. হিরের শঙ্খ, হিরের চক্র

চেহারা আর চোখ দেখে যাকে নিরেট পাথর বলেই মনে হয়, সেই রবি রে যে হিরের মুকুট দেখে এভাবে গলে গেছে, তা তো জানতাম না। কথা তো নয়, যেন হিরের ফুলকি ঠিকরে ঠিকরে আসছিল ওর গলার মধ্যে থেকে…হিরের পরশমণি ছুঁয়ে গেছিল ওর দুই চক্ষুকেও…মুহুর্মুহু বিদ্যুৎবহ্নির আভাস জাগছিল ওর বিশেষ গড়নের দুই চোখে…বালাজি-প্রভাব ওকে অবশ্যই উদ্দীপ্ত করেছিল, নইলে ওর মতো চাপা স্বভাবের মানুষ আচম্বিতে এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে কেন?

বালাজির মুকুটে আছে আঠাশ হাজার হিরে। একটা নয়, আঠাশ হাজার হিরের সন্নিবেশ সম্ভব হয় কি করে, আমি (যাকে আমার প্রিয় লেখকবন্ধু মৃগাঙ্ক রায় বলে হীরক চক্ষু) যখন তাই নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছি আমার খুদে মগজের মধ্যে,তখন রবি রে ফের শুরু করেছিল বালাজির অন্য অন্য হিরের সম্ভাব প্রসঙ্গ। বলেছিল–

ইন্দ্র, আমার চিত্ত চমৎকৃত হয়েছিল যখন শুনলাম আঠাশ হাজার হিবে সমেত বালাজির মুকুটের ওজন…কত হতে পারে? আচ্ছা, আচ্ছা, আমিই বলছি…ষাট পাউণ্ড! প্রায় সোয়া সাতাশ কিলোগ্রাম! ভাবা যায়? সোয়া সাতাশ কেজি ওজনের হিরে বসানোর মুকুট মাথায় নিয়ে সিবে রয়েছেন বালাজি! তিনি কি নারায়ণ? কেন না, তার হাতে আছে শঙ্খ আর চক্র। দুটো হাতিয়ারকেই ঝকমকে করে তোলা হয়েছে হিরের পর হিরে বসিয়ে। হাত দুটোতেই শুধু হিরে আর হিরে বসিয়ে যেন নক্ষত্র আঁকালো দু’টো ছায়াপথ বানানো হয়েছে। কানের লতিতে ঝুলছে প্রকাণ্ড কর্ণ-অলঙ্কার—হীরকম। ইন্দ্র, ইন্দ্র, থ’ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল আমাকে এত হিরের একত্র সমাবেশ দেখে। এক অঙ্গে এত হিরে! জড়োয়ার জেল্লা যে কি পরিমাণে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে, চোখের রন্ধ্র দিয়ে রোশনাই মগজে ঢুকে চিন্তা বুদ্ধিকে অসাড় করে দিতে পারে, ব্রেনকে বিকল করে দিয়ে

আঙুলের ডগা পর্যন্ত অসাড় করে দিতে পারে–বালাজির বিগ্রহ তার সেরা নিদর্শন —এই পৃথিবীতে…মাত্র ন'হাজার মাইল ব্যাসের এই পৃথিবীতে বুঝি থরহরিকম্প জাগাতে পারে শুধু এই বালাজি বিগ্রহ তার শ্রীঅঙ্গের এত হিরের অলৌকিক প্রতাপ বিকীর্ণ করে।

ইন্দ্র… সেই থেকে… সেই মুহূর্ত থেকে… হিরে আমাকে টেনেছিল, হিরে আমাকে জাদু করেছিল…, হিরে আমাকে হিপনোটাইজ করেছিল… হিরে… হিরে… হিরে… এই হিরে কোত্থেকে আসছে… কোথায় যাচ্ছে… কত কি কাণ্ড করে চলেছে… তা আমাকে জানতে হবে… জানতেই হবে… সে ভাবেই হোক।

বলতে পারিস আমি অলৌকিকভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছিলাম। হিরের মধ্যে নিশ্চয় একটা অতিপ্রাকৃত আকর্ষণ আছে… ম্যাগনেটিক আকর্ষণ সে তুলনায় কিছুই নয়… এই টান… হিরের এই আকর্ষণ নিয়ে গবেষণা করা দরকার। ব্যাপারটা আমার মাথার মধ্যে আছে।

ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, বৈদিক যুগ থেকে হিরে কেন বিস্তর বিস্ময়কর কেন্দ্রবিন্দু দখল করে রয়েছে… কী শক্তির মহিমায়… তা নিয়ে গবেষণা একদিন আমি করবই… তার আগে গড়ে তুলব নিজের হিরের কারখানা। ইন্দ্র, ব্যাঙ্গালোরের জহর কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছি এই প্রেরণা নিয়েই। হয়তো বালাজি'র মহিমায়… হয়তো!

ধরনা দিয়েছিলাম নন্দিতা কৃষ্ণা'র কাছে। তুই তো জানিস, অনেক রঙ্গ রসের গল্প করেছি তোকে আমার এই মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ লাইনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে। ডাক্তারদের সঙ্গে দহরম মহরম বাখতে গিয়ে আপনা থেকে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে যে সব ডাক্তাররা মহিলা সেবিকা রাখেন-তাদের সঙ্গে। নার্স… নার্স… মেট্রন… সেবিকা বললে হয়তো মাথায় ঢুকবে না, তাই ইংলিশ। করে দিলাম। ডাক্তারি একটা বিজনেস… উকিল ব্যবসার মতো… অনেক উকিল যেমন লে িজুনিয়র রাখেন, অনেক ডাক্তারও তেমনি লেডি সাগরেদ রাখেন… মহিলা পেসেন্ট এলে যাতে অসুবিধা না হয়… ডাক্তার ভিজিট করতে গিয়ে এই সব অ্যাট্রাকটিভ নাস-মেট্রনদের সঙ্গে অটোমেটিক্যালি আমার একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠত… নো, ম্যান, নো… অন্য সম্পর্ক গড়ে তোলার চান্স দিতাম না… তাহলে তো শ্রীকৃষ্ণের মতো হাজার যোল গোপিনী গড়ে উঠত এতদিনে… ওই একটা ব্যাপারে আমি খুব সজাগ… এমন কি নন্দিতা কৃষ্ণা নাম্নী সেই মেট্রনটির ক্ষেত্রেও… ভদ্রমহিলা যুবতী, রূপসী, টান-টান শরীরের অধিকারিনী, কিন্তু

নিয়মিত রতিতৃপ্তি দিয়ে যেত ইহুদি ডাক্তার মহাশয়কে... বয়স যাঁর সত্তর... ইন্দ্রিয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে ইয়োহিমবাইন হাইড্রোক্লোরাইড ইঞ্জেকশনটা নিতেন আমার কাছ থেকে...তখন তো ভায়াগ্রা বাজারে আসেনি... ভুরু কুঁচকোসনি... মূল কথা থেকে অমূল কথায় যেতে গেলে একটু-আধটু রসেব কথা এসে যাবেই...

চেন্নাই... মানে, মাদ্রাজের এই নন্দিতা কৃষ্ণা যে কি টেরিফিক ব্ল্যাক বিউটি, তা তোকে ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। মিশমিশে পাথর কুঁদে গড়া বললেই চলে। বালাজি বিগ্রহ যে পাথর থেকে তৈরি, অনেকটা সেই রকম পাথরের মতো। কিন্তু পাথরের জেল্লার জন্যে তার সঙ্গে দহরম মহরম সম্পর্ক গড়ে তুলেনি। ভদ্রমহিলা ব্যক্তিগত জীবনে কি ছিল, তা নিয়ে মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করিনি—আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তার জহর জ্ঞানের জন্যে।

নিছক জহর নয়, হিরে নামক পাথরটা সম্বন্ধে নন্দিতা একটা লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়া বললেই চলে। জীবন্ত বিশ্বকোষ। একদিকে বালাজির প্রায় সেবাদাসী। অষ্টপ্রহর বালাজির নাম সংকীর্তন করত বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। আর ঠিক এই একটা কারণেই আমি নিবিড় নৈকট্য রচনা করেছিলাম নন্দিতার সঙ্গে।

ইন্দ্র, কল্পনার সঙ্গে ভাব হওয়ার পর কথায় কথায় নন্দিতা প্রসঙ্গ এসে যেত। ঈর্ষার ফুলকি দেখতে পেতাম কল্পনার ফিকে সবুজ চোখের তারায়। এই মেয়েরা একটা জাত বটে। বিশেষ জীব। এদের ছাড়া গত অচল। অথচ এরা এত। ঈর্ষাকাতর যে কহতব্য নয়।

উল্টোপাল্টা বকছি? মেয়েদের ম্যাটার এলেই আমি একটু টলে যাই, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড...আফটার অল, আই অ্যাম আ হিম্যান ...

যাকগে... যাগগে...নন্দিতা... নন্দিতা নাটকে আসা যাক। নন্দিতা... কৃষ্ণা কামিন নন্দিত... হিরে নিয়ে গুলে খাওয়া কন্যা নন্দিতা... আমার ভেতর পর্যন্ত গুলিয়ে ছেড়েছিল শেষ পর্যন্ত, স্রেফ হীরক শক্তির ব্যাখ্যা শুনিয়ে...

বালাজি যার ধ্যান-জ্ঞান... শয়নে স্বপনে যে শুধু বালাজি নিয়েই ভাবে আর পাঁচজনকে ভাবায়, সে যে তার কালো চোখের বিদ্যুৎ দিয়ে আমার ভেতর পর্যন্ত তোলপাড় করে দেবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! হিরে নিয়ে তড়বড়িয়ে কথা বলতে

গিয়ে হয়তো একটু বাড়িয়েই বলেছিল… তা বলুক… আমি তো ক্রিমটুকু তুলে নিয়েছিলাম ওর ফেনাময় কথার স্রোতের মধ্যে থেকে…

বালাজি কালো পাথরে বিগ্রহ হতে পারে, কিন্তু বড় সঞ্জীব বিগ্রহ, পাথর দিয়ে গড়া বলেই বোধহয় তিনি পছন্দ করেন পৃথিবী গ্রহের সেরা পাথর… হিরে পছন্দটা এমনই প্রবল যে ভক্তের আঙুল থেকে হিরের আংটি পর্যন্ত ছিনিয়ে নেন।

আমি এই পর্যন্ত শুনে তাজ্জব হয়ে গিয়ে বলে ফেলেছিলাম, সে কী! পাথরের বিগ্রহ কি রক্তমাংসময় আঙুল থেকে আংটি কেড়ে নিতে পারে?

নন্দিতা বলেছিল, ঠিক এই রকম আপাত অসম্ভব ব্যাপারটাই যে ঘটে গেছিল একদিন।

আমি বলেছিলাম, বালাজি বেদি থেকে নেমে, ভক্তের আঙুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে নিজের আঙুলে পরে, ফের বেদিতে উঠে গিয়ে বসে পড়েছিলেন?

তা কেন? তা কেন? মুখর হয়ে উঠেছিল আবলুস মেয়ে নন্দিতা কৃষ্ণা-ভক্ত এক সময়ে বালাজির সামনে এসে কথা দিয়ে গেছিল, তার অমুক মনোবাঞ্ছা যদি পূর্ণ হয়, তাহলে আঙুলের এই ঝকমকে মস্ত হিরের আংটি দিয়ে যাবে বালাজিকে।

ঘুষ?

প্লীজ, রসিকতা নয় বালাজিকে নিয়ে। মানৎ করলে তা দিতে হয়, হিন্দুধর্মের রেওয়াজ। বালাজি ভক্তের ইচ্ছে মিটিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ইচ্ছাপূরণের শক্তি দিয়ে… ভক্ত কিন্তু কথা রাখেনি… আংটিটা আঙুলে পরে এসে যখন জোড় হাতে প্রণাম করে, আংটি আঙুলে রেখেই, সরে পড়তে যাচ্ছে… তখনই ঘটে গেল অলৌকিক কাণ্ডটা।

আঙুল থেকে আংটি খুলে বেরিয়ে গেল?

আজ্ঞে। হাওয়ায় উড়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল… বলুন তো কোথায়?

বালাজির চরণতলে?

প্রণামী নেওয়ার থলিতে।

অদৃশ্য শক্তির টানে?

আজ্ঞে।

এমনও তো হতে পারে, আমি ধীরে সুস্থে বলেছিলাম—পুরো ব্যাপারটাই রটনা।

রটনা! কথাটার অর্থ?

অতীব সরল। মানৎ করা আংটি আঙুল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাণ্ডারা ফেলে দিয়েছিল প্রণামীর থলিতে।

তিরুপতির মন্দিরে পাণ্ডারা গুণ্ডা নয়, সব্বাই তা জানে।

আমি আর কথা বাড়াইনি। হিরে প্রসঙ্গে চলে গেছিলাম। নন্দিতার মুখ থেকেই শুনেছিলাম, তিরুপতির রত্নগর্ভে সঞ্চিত হয়ে এসেছে অমূল্য অনেক হিরে সুদূর অতীতকাল থেকে ইণ্ডিয়া যখন ছিল ডায়মণ্ডের একমাত্র উৎস—এই পৃথিবীতে। দক্ষিণ ভারতের বহু রাজ্যের উত্থান আর পতন ঘটেছে এই হিরে সম্পদকে কেন্দ্র করে। সাম্রাজ্য শক্তি বাড়িয়েছে, শক্তি হারিয়ে ধুলোয় বিলীন হয়েছে—মূলে রয়েছে খনি থেকে উঠে আসা হিরে। যত হিরে উপহার দিয়েছে খনি, তার বেশির ভাগ গেছে তিরুপতি আর অন্য অন্য মন্দিরে—ভক্ত শাসকদের প্রণামী হিসেবে। বিগ্রহদের তুষ্ট রাখবার পর নৃপতিরা নিজেদেরকে হিরে দিয়ে সাজিয়েছে নর-দেবতা হওয়ার অভিলাষে। হিরে এনে দিয়েছে দেব-দ্যুতি, মুগ্ধ থেকেছে প্রজারা। ইউরোপের দূর দুর অঞ্চল থেকে পর্যটকরা এসেছে, রাজসভায় হিরের ছড়াছড়ি দেখে হতভম্ব হয়ে ফিরে গিয়ে সেই গল্প শুনিয়েছে স্বদেশে। হিরে, হিরে, হিরে-হিরেময় দেশ এই ভারতবর্ষ। যোড়শ শতাব্দীতে এমন এক পর্যটকের আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেছিল বিজয়নগরের রাজার ঘোড়র গায়ে হিরের সাজ দেখে। এত হিরে দিয়ে তো একটা মস্ত শহর মুড়ে দেওয়া যায়!

হায়দ্রাবাদের প্রান্তে পাহাড়ের ওপর রয়েছে গোলকোণ্ডার রাজাদের কেল্লা প্রাসাদ। তিনশো বছর আগে সেই প্রাসাদ লুঠ করে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে মোগল লুঠেরা-রা। পরিত্যক্ত সেই প্রাসাদ এখন চিল আর মাছরাঙাদের রাজত্ব। তাদের কলরবেই মুখর হয়ে থাকে একদা বিপুল ঐশ্বর্যের কেন্দ্র-আর জেগে থাকে অশ্রুত দীর্ঘশ্বাস-হিরে নিয়ে যারা একদা ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল—এই দীর্ঘশ্বাস সেই বিদেহীদের।

ভারতবর্ষের সবচেয়ে নামজাদা হীরক রাজত্ব ছিল এই গোলকোণ্ডায়। এত বছর পনেও হিরে-ঐশ্বর্য নিয়ে কথা বলতে গেলেই গোলকোণ্ডার নাম এসে যায়। সম্পদ আর গোলকোণ্ডা-সমার্থক হয়ে এখানকার হিরে বর্ষণ করেছে রক্তাক্ত অভিশাপ। কোহিনুর, হোপ ডায়মণ্ড, রিজেন্ট-ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই হিরদের প্রথম আবির্ভাব তো গোলকোণ্ডায়, এ ছাড়াও আরও অনেক চোখ ধাঁধানো হিরে এই গোলকোণ্ডা থেকে বেরিয়ে এদেশে বিদেশে রক্তঝরানো অনেক নাটকের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা… এই রক্তলোভী হিরেরা… এদেশ থেকে গেছে ভারতবর্ষের বাইরে হাত বদল হতে হতে… বিক্রি, উপঢৌকন, উৎকোচ, চুরি, লুঠ। আজও ইণ্ডিয়ার বহু পুরোনো বড়লোকের প্রাসাদে পাওয়া যাবে এমন সব হিবে, যাদের কাটাই করা হয়েছে সেকেলে পন্থায়—যে কাটিং পদ্ধতির মডার্ন অনুকরণ আজকের। হিরেদের গায়ে দেখতে পাওয়া যায়। হিরে কাটিংয়ের এহেন অভিনবত্ব থেকে। আঁচ করে নেওয়া যায়, কি পর্যায়ে পোঁচেছিল হীরক সমৃদ্ধ ইণ্ডিয়ার হিরে কারিগরেরা।

আজ তারা নেই। ইন্দ্র, ভাগ্যের বিপুল পরিহাসে চাকাও ঘুরে গেছে। ইণ্ডিয়ার হিরে-খনিগুলোয় হিরে ফুরিয়ে যাওয়ার অনেক… অনেক বছর পরে… গোলকোণ্ডার শেষ হিরে কারবারি গোলাকোণ্ডা ছেড়ে চলে যাওয়ার বহু… বহু বছর পরে… বিশ্বের হিরের। ফের এই ভারত দিয়েই যাচ্ছে আর আসছে।

ইন্দ্র, তুই কি ধৈর্য হারাচ্ছিস? হিরে নিয়ে বেশি ফেনিয়ে যাচ্ছি? আমি নিরুপায় ইন্দ্র, আমি নিরুপায়। “হিরে এমনই একটা পাথর যার মধ্যে আছে একটা সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার… হিরে নিয়ে কথা শুরু করলে তাই তো তা শেষ করা যায়

… এই পৃথিবীতে অনেক ভেল্কি অনেক উত্থান পতন দেখিয়ে গেছে ঝকমকে এই পাথরেরা. দেখাচ্ছে এখনও… আমি বড্ড বেশি জড়িয়ে গেছি এই বিজনেসে—লক্ষ্য একটাই. ইণ্ডিয়ার লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনবই।

কি বলছিলাম? এই পৃথিবীর বেশির ভাগ হিরের প্যাসেজ এখন এই ইণ্ডিয়ার ভেতর দিয়ে। চাকা ঘুরছে, ইন্দ্র, চাকা ঘুরছে… ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে… ইয়ে… নেবে।

তবে হ্যাঁ, বেশির ভাগ হিবেই কিন্তু একেবারে খুদে… এক ক্যারাটের ফ্র্যাকশন… ভগ্নাংশ। তিরিশ বছর আগেও খুদে খুদে এই হিরে মহাশয়দের দরকার ছিল শুধু একটাই ব্যাপারে… ড্রিলের ডগায় সেঁটে কাটাই করার জন্যে। বালির মতো ছোট

ছোট হিরে কেটে রত্ন বানাতে যে লেবার খরচ হতো নিউইয়র্ক, অ্যান্টওয়ার্প, তেল আভিভে-তাতে দরে পোষাত না।

ভেলকি শুরু হয়ে গেল ১৯৭০ সাল থেকে। একদল জৈন জহুরিদের উদ্যোগে। এঁরাই কোমর বেঁধে লাগলেন। অতি ছোট হিরে মহাশয়দের কাটাই পালিশ করে এক্সপোর্টের ব্যবস্থা করলেন। শুরু করেছিলেন বোম্বাই শহরে, সরে গেলেন সুরাট শহরে... আরও কয়েকটা শহরে... অন্য অন্য প্রদেশে... শুরু হয়ে গেল হীরক। বাণিজ্য নতুন চেহারায়।

১৪. হিরে। হিরে! হিরে! আসছে সুদিন ফিরে!

১৪. হিরে। হিরে! হিরে! আসছে সুদিন ফিরে!

হিরের কথায় এমনই আবিষ্ট হয়ে গেছিল রবি রে যে, আমি শ্রীহীন ইন্দ্রনাথ রুদ্র মুখ খোলবার কোনও চান্সই পাচ্ছিলাম না।

দম নেওয়ার জন্যে ও বোধহয় সেকেণ্ড খানেক বিরতি দিয়েছিল। আর ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ফেটে পড়েছিল আমার কৌতূহল।

রবি, ইণ্ডিয়া কি হিরে-কাটিং শিল্প চাতুর্যে আজও জগত সেরা?

দু'চোখ প্রায় কপালে তুলে ফেলে বলেছিল অসাধারণ স্মার্ট রবি-ইণ্ডিয়ার আর্টিস্ট্রি, এক কথায়, তুলনাবিহীন। বেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। জিন এফেক্ট! জিন এফেক্ট! জহুরিদের জিন এফেক্ট যাবে কোথায়?

বলে, চোখের ফ্ল্যাশ মেরে চেয়ে রইল আমার কথার ফ্ল্যাশ শোনবার জন্যে। আমি কিন্তু উসকে দিয়েই বোবা মেরে গেছিলাম।

হিবে জিনিসটা সত্যিই একটা উত্তেজক পদার্থ। নইলে রবির মতো ধীর স্থির বচন দক্ষ পুরুষ এত কথা খরচ করতে যাবে কেন আমার মতো হিরে-আকাটে মানুষের কাছে?

ইন্দ্র, সুরাটের জহুরিরা দিনে ক'ঘণ্টা হিরে-পালিশ করে জানিস? লেবার-ল অনুসারে তো আট ঘণ্টা কাজ করার কথা। ওরা খাটে ক'ঘণ্টা? জানিস না। জেনে রাখ। টানা দশ ঘন্টা। বিশ্বাস না হয়, দেখে আয় সুরাটের বুস্টার প্ল্যান্টে। বেঙ্গল পিছিয়ে যাবে না কেন? ওয়ার্ক কালচার নিয়ে খালি লেকচার মারলেই হয় না।

এই রে! এ যে পলিটিক্স এনে ফেলছে! ওতে আমি নেই। এক্কেবারে সাইলেন্ট হয়ে রইলাম।

হিরের নেশায় তড়বড় করে বলে গেল রবি-আট লাখ... শুনছিস? আট লাখ ইণ্ডিয়ান ডায়মণ্ড কারিগর এখন অতি পুঁচকে হিরে কেটেও খাসা হিরে বানিয়ে দিচ্ছে। খুদে খুদে হীরক-কণাদের গায়ে ৫৮টা দিক তুলে তবে ছাড়ছে।

কথাটা আমার কর্ণকুহরের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে কুহক সৃষ্টি করে গেছিল আমার মগজের কোষে কোযে। যে হিরক-কণা সাইজে প্রায় বালুকদানার মতো, তার গায়ে আটান্নটা দিক খুদে খুদে তোল তো আলিবাবার আশ্চর্য প্রদীপের সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়! একি জাদুবিদ্যা!

আমার মনের প্রশ্নটা টেলিপ্যাথি দিয়ে জেনে নিয়ে মুখে মুখে জবাব দিয়ে গেছিল রবি-জহর বিদ্যা... জহর বিদ্যা... একেই বলে ইণ্ডিয়ান হিরে কাটিং! ফলটা কি হয়েছে জানিস? ওয়ার্ল্ডের নানান অঞ্চল থেকে, এমনকী আমেরিকা থেকেও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মণ্ড নামে বাতিল হিরে চলে আসছে ইণ্ডিয়ায়-খুবসুরৎ হয়ে ফিরে যাচ্ছে জড়োয়ার জেল্লা বাড়াতে।

আমি চুপ।

রবি বলছে, ইন্দ্র, এই হিরে জিনিসটার সঙ্গে শনি গ্রহের কোনও সম্পর্ক আছে। কি না, সেটা নিয়ে ভাবতে পারিস। না, না, তুই জ্যোতিষী নস, কিন্তু তুই ডিটেকটিভ। ডিটেকশনের ডিডাকটিভ মেথড প্রয়োগ করে ভেবে দেখতে পারিস, মস্ত গ্রহের অশুভ আকর্ষণ কেন মন্দ ভাগ্য রচনা করে যায় মানুষের জীবনে। জ্যোতিষশাস্ত্র একেবারে উড়িয়ে দিসনি। যা জানা নেই, তার অস্তিত্ব নেই–এমন ধারণা মাথার মধ্যে পোষণ করলে বিজ্ঞান আজ অদৃশ্য জগতের অনেক রহস্যময় শক্তির হদিশ পেত না।

আমি মুখ খুলেছিলাম রবি যেই একটু আনমনা হয়েছে—হিরের প্রতাপ অদৃশ্য অবস্থায় শক্তি খাটিয়ে তোকে নিয়ে এল সুরাটে। তারপর?

সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল রবি। এতক্ষণ যেন ঘোরে ছিল—হিরের ঘোর। সত্যিই একটা আশ্চর্য পাথর। এমন মোহ সৃষ্টি করতে পারে...

রবি বললে, হিরেময় ধুলো ইণ্ডিয়ার প্রাচীন যে শহরের গলিতে উড়ছে, পদার্পণ করলাম সেই শহরে! হিরেময় ধুলো!

আজ্ঞে! পুরনো সুরাটের বিশেষ কয়েকটা গলির মধ্যে ঢুকলে ঠিক এই রকমটাই তোর মনে হবে। ধুলো পর্যন্ত হীরকিত... বিশেষণটা বাংলায় নতুন... তাই না? হোক। সরু রাস্তায় পা দেওয়ার জায়গা অথচ কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়ে চলেছে নিমেষে নিমেষে। বহু রঙের, বহু চেহারার হিরে ঝকমকিয়ে যাচ্ছে সেখানে পলকে পলকে। মানুষে মানুষে গিজগিজে সেই সব গলিতে চার চাকার গাড়ি ঢোকা বন্ধ সরকারি নির্দেশে। আমি, এই ছাপোযা বাঙালি, ঢুকেছিলাম সেই হিরের গলিতে। শুনেছিলাম হিরে কিনিয়ে গুজরাতিদের র্যাপিড-ফায়ার গুজরাতি বুকনি। দেখেছিলাম, এক ভিখিরি ছেলে কিভাবে গলির ধুলো বুরুশ দিয়ে চেঁচে তুলছে কৌটোর মধ্যে যদি আসমান প্রসন্ন হয়, কুচো হিরে পেয়ে যেতে পারে-হাত ফসকে পড়ে যাওয়া হিরের কণা।

হিরে পাথরটার সত্যিই বোধহয় একটা অদৃশ্য প্রভাব আছে। মেপে আর ওজন করে কথা বলার পারিপাট্যে যাকে জহুরি বিশেষ বলা যায়, সেই রবি'র সেদিনকার আচ্ছন্ন অবস্থা দেখে আমি আব বাগড়া দিইনি।

হিরে-জ্বর বড় ভয়ানক জিনিস। নইলে বাক্য-বিশারদ রবি এত কথা সেদিন বলবে কেন? বলেছিল বলেই অবশ্য এই রহস্য উপাখ্যানের মূল সূত্রটা ধরে ফেলেছিলাম।

হিরের গলিতে সেদিন কত রকমের আর চেহারার হিরে ঝলসে উঠেছিল রবির চোখের সামনে, সে সব কাহিনী রোমাঞ্চকর নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই না। পাতলা কাগজের মতো কালো হিরেও নাকি ও দেখেছিল—অবিশ্বাস্য কাটিং দেখে ওর চোখ ঠিকরে গেছিল। দেখেছিল ক্যানারি হলুদ হিরে। গুঞ্জন শুনেছিল পিছনে গুজরাতি ভাষায়—হুঁশিয়ার! এ যে ঝেটিয়ে হিরে কিনতে এসেছে!

রবি তখন গুজরাতিতেই বলেছিল, ঝেটিয়ে কিনতে আসিনি। হলুদ হিরে, কালো হিরে, কমলা হিরে, লাল-বেগুনি-সবুজ হিরেতে আমার দরকার নেই।

তবে কি দরকার?

ছোট হিরে! খুব ছোট সাদা হিরে!

বালুকা-সদৃশ আশ্চর্য হীরক কণিকাদের দর্শন পেয়েছিল রবি তখনই। জহরি দণ্ডপথের দৌলতে!

১৫. জহুরি দণ্ডপথ আর রঙ্গি হিরে

১৫. জহুরি দণ্ডপথ আর রঙ্গি হিরে

রবি বুঝি সেদিন হীরক-মদিরায় হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিল। নইলে অত গোপন কথা অমন গড়গড়িয়ে বলে যাবে কেন?

গুজরাতি জহুরিদের বাক্য-বর্ষণকে ও র্যাপিড-ফায়ার বচনমালা বলেছিল। কিন্তু ওর নিজের মুখবিবর থেকেই কথার বুলেট বেরিয়ে আসছিল মেশিনগানের বুলেট বর্ষণের মতো।

ইন্দ্র, জহুরি দণ্ডপথ লোকটা যে বালি-হিরের কারবারে এক্সপার্ট, সেটা জেনে গেলাম দালালের মারফত। এই এক যুগ এসেছে ইণ্ডিয়ায়! দালালদের যুগ। তুই যা চাস, তাই পাবি, শুধু দালাল নামকশিবানুচরদের খুশি রাখতে হবে। শিবের অনুচর বলতে কাদের বোঝাচ্ছি, তা নিশ্চয় তোকে বুঝিয়ে দিতে হবে না।

যাগগে, যাকগে, জহুরী দণ্ডপথ লোকটা গলির গলি তস্য গলির মধ্যে একটা ছোট কিন্তু যেন গান-মেটাল দিয়ে সুরক্ষিত ঘরে বসেছিল মেঝের লিনোলিয়াম। কার্পেটে। সামনে একটা মামুলি কাঠের ডেস্ক-রাইটিং ডেস্ক-যে রকম ডেস্ক আমাদের ঠাকুরদাদাদের আমলে দেখেছি—তবে এই ডেস্কে রাইটিং মেটিরিয়াল কিসসু থাকে না—শ্বেতভুজা সরস্বতীর প্রবেশ এখানে নিষেধ—থাকে শুধু মা। লক্ষ্মীর চরণ বন্দনা করবার মতো অবিকল বালির সাইজে রঙিন হিরে।

আসছি, আসছি, রঙিন হিরের অবিশ্বাস্য বর্ণনায় আসছি। সে বর্ণনা শুনলে তোর প্রত্যয় হবে না জানি, তবুও বলে যাব। তার আগে শুনে রাখ, ছোট্ট এই ঘরটার প্রতিবর্গ ইঞ্চির ওপর নজর রেখে চলেছে বেশ কয়েকটা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা আর টিভি। চার দেওয়ালের ওপরের কোণে শুধু দেখা যাচ্ছে তাদের লেন্সের ঝিকিমিকি। বুঝে নিলাম, বিবররাসী এই ব্যক্তির চারদিকে তাগ করে রয়েছে বেশ

কয়েকটা আধুনিকতম আগ্নেয়াস্ত্র-সাইলেন্সারের দৌলতে যারা বুলেটের ঝড় বইয়ে দিতে পারে-নীরবে নিঃশব্দে।

অধীর না হয়ে কান পেতে শুনে যা, ইন্দ্র। আমার জীবন বড় বাঁক নিয়েছিল এই ঘরে… অথবা, এই ঘরের পিছনকার জহর কারখানায়।

জহুরি দণ্ডপথ লোকটাকে মূর্তিমান ইন্দ্র বলা যেতে পারে… চমকে উঠলি? আরে বাবা, ইন্দ্র যে সহস্র চক্ষুর অধিকারী, তা তো একটা বাচ্চা ছেলেও জানে… এই মানব-ইন্দ্র, ইয়ে, মানবেন্দ্রর হাজার চোখ গজিয়েছে মেয়েছেলে দেখে দেখে নয় —স্রেফ হিরে দেখে দেখে।

বয়স যথেষ্ট হয়েছে। অথচ সুপুরুষ। গুজরাতিরা বোধহয় যাদবকুল থেকে এসেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি পেয়েছে পুরোমাত্রায়। তবে মনে হয় শ্বেতসুধায় স্নান করে আসার দরুণ অর্জন করেছে অমন ধবল বরণ। দণ্ডপথ সদাহাস্যময়। জহর বণিক। হাসি তাঁর চোখের তারায় যা কালো হিরে বলেই মনে হয়—হাসি ঠোঁটে, কথাবার্তা এতই মিষ্টি যে, মনে হয় শুকনো চিড়েও ভিজিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

আমার এই মারকাটারি ফিগার দেখে এতটুকু ভড়কে না গিয়ে আমার বচন আর অভিপ্রায় ধৈর্য সহ শ্রবণ করলেন। তারপর ওই কাঠের ডেস্কের ডালা খুলে, আমাকে ভেতরের বস্তু না দেখিয়ে, একে একে বের করলেন রুপোর বাটি।

এক-একটা বাটিতে এক-এক রঙের হিরে। সাইজে বালির দানার চাইতে বড় নয়। কিন্তু প্রতিটা বাটি থেকে ঠিকরে আসছে রামধনুর এক-একটা রং। সংক্ষেপে যাকে আমরা বলি ভিবগিওর—ভায়োলেট, ইণ্ডিগো, ব্লু, গ্রিন, ইয়োলো, অরেঞ্জ, রেড।

আমি, ইন্দ্রনাথ, আমি শ্রী রবি রে, চোখের তারা নিশ্চয় স্থির করে ফেলেছিলাম সেই অবর্ণনীয় বর্ণচ্ছটা দেখে।

জহুরি দণ্ডপথ তখন ঈষৎ হাস্য করেছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাদা হিরে কোথায়? আসলি হিরে? এ তো সব রঙিন কাচ।

জহুরি দণ্ডপথ তারিয়ে তারিয়ে রসিয়ে রসিয়ে বলেছিলেন, মাই ডিয়ার বেঙ্গলি ফ্রেণ্ড, সাত রঙের হিরে মিশিয়ে দিলেই সাদা রঙের হিরে হয়ে যায়। এই দেখুন, বলে, ডেস্কের ভেত্র থেকে বের করেছিলেন অষ্টম বাটি—যে বাটিতে রয়েছে শুধু সাদা বালি-হিরের বালি।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কালো হিরে কই?

অমনি নবম বাটি বেরিয়েছিল ডেস্কের অন্দর থেকে। তাতে থই থই করছে, খুক খুক করছে কালো হিরের বালি।

হিরের চোখ নাচিয়ে জহুরি দণ্ডপথ তখন আমাকে যে হিরে-বন্দনা শুনিয়েছিলেন, তার সবটা গুছিয়ে তোকে বলতে পারব না। শুধু শুনে রাখ, এই বিশ্বে, এই ব্রহ্মাণ্ডে অযুত নিযুত সূক্ষ্ম শক্তি অজস্র বর্ণ নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। মানুষের শরীর-মন-ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই সূক্ষ্ম শক্তিদের এক-একটা হিরের কাঠামোয় ধরে রাখা হয়েছে। এ শক্তি আছে শুধু জহুরি দণ্ডপথের। তিনি তা অর্জন করেছেন প্রাচীন পুথিতে লেখা মন্ত্রশক্তি দিয়ে। সে পুঁথি তিনি পেয়েছেন তিব্বতে।

আমি নিজে সেলসম্যান। সেলস টক দিয়ে আমাকে ভাওতা মারা যায় না। আমরা পুঁদে সেলসম্যানরা, বলেই থাকি, এক সেলসম্যান আর এক সেলসম্যানকে ঠকাতে যায় না।

তাই মনে হল, জহুরি দণ্ডপথ সত্য বলছেন।

কথা বাড়ালাম না। শুধু জানতে চাইলাম, এমন খুদে হিরে কাটাই হচ্ছে কোথায়? আটান্ন দিক তুলছে কারা?

জহুরি দণ্ডপথ আমার চোখে চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর মধুর হেসে বললেন, ইয়ংম্যান, যদি তাদের কাউকে পছন্দ হয়, তাহলে দেখাতে পারি।

আমি অবাক গলায় বলেছিলাম, আমি হিরে পছন্দ করতে এসেছি, হিরে কাটিয়েদের নয়। কিন্তু আটান্ন দিক কেটে বের করছে যারা, তাদের দেখার ইচ্ছেটা আছে।

দণ্ডপথ বললেন, তারা মনের মানুষদের মন কেটে আটান্ন দিক বের করতে পারে।

হেঁয়ালি বুঝলাম না। শুধু চেয়ে রইলাম।

দণ্ডপথ তখন যা বললেন, তা পরে বলছি। তবে... কল্পনা চিটনিসকে প্রথম দেখলাম সেই হিরে কারখানায়।

১৬. মানিক দানার কারখানায়

১৬. মানিক দানার কারখানায়

ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আমার অদ্ভুত কাহিনি তোর কাছে উদ্ভট মনে হচ্ছে—তোর চোখে অবিশ্বাসের রোপনি দেখছি, তাই ছোট করে আনছি। মূল কাহিনি থেকে একটু-আধটু ফ্যাকড়া বেরয়। বড় গাছের শেকড় যেমন অনেক, ডালপালাও তেমনি অনেক। সুপুরি, নারকেলগাছের ছোট গপ্পো এটা নয়। এ বড় জাঁকালো-জমাটি ব্যাপার।

জহুরি দণ্ডপথকে চোখে চোখে রেখে কথায় কথায় কেটে কেটে যে ব্যাপারটা কারখানায় ঢোকবার পূর্বাহ্নে জেনেছিলাম, তা অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু সত্যি।

এই ব্যাপার আমি হো চি মিন শহরে দেখেছিলাম। ফের দেখলাম সুরাটে। ভিয়েতনামের মিস্টার কিউপিড ইণ্টারন্যাশনাল ম্যাচমেকার্স সার্ভিস সাড়ে তিন হাজার কুমারী... ইয়ে... অক্ষতযোনি, মেয়েদের কাজ দিয়ে একটা বাড়িতে রেখে দেয়... মাইনে দেয় না... কিন্তু বর জুটিয়ে দেয়... ফরেনার বর... অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি... গরিব মেয়েরা রীতিমতো দরখাস্ত পাঠিয়ে সেখানে আসে বর জোটাতে... রিয়াল ভার্জিন কি না, তার পরীক্ষা দিতে হয়... ভার্জিনিটি টেস্ট... হাইমেন ছিন্ন হয়েছে কিনা... হাইমেন মানে যে সতীচ্ছেদ, তা তোর মতো চিরকুমারকে বোঝানো দরকার বলেই বললাম... তলপেটে রেখা পড়েছে কিনা অথবা, সিজারিয়ান অপারেশনের কাটা দাগ আছে কিনা, তাও দেখা হয়—আগে পেটে বাচ্চা এসেছিল কিনা জানবার জন্যে... জঘন্য... কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ... আজও এই সংস্থা চালু রয়েছে... তোর যদি সতী বধূর দবকার হয় যেতে পারিস... হাসছিস?

জহুরি দণ্ডপথ ঠিক এই সিস্টেম চালু করেছেন নিজের মাণিক কারাখানায়। স্বয়ংবরা হতে ইচ্ছুক মেয়েদের এনে কাজ শেখান... কাজ করান... বর জুটিয়ে দেন... ভার্জিনিটি টেস্ট করেন কিনা, সেটা জানতে চাইনি... হিমালয়ে আজও দ্রৌপদী গোত্রের মেয়েরা পাঁচখানা বর রাখতে পারে... বিয়ের আগে বা পরে... জানিস না? জেনে রাখ। সেলুকাস, বড় বিচিত্র এই দেশ।

এইসব বাগাড়ম্বর শুনিয়ে মানিক কারখানায় আমাকে ঢুকতে দিয়েছিলেন জহুরিমশাই। ফিকে সবুজ হিরে চোখ দিয়ে একটি মেয়ে আমাকে টেনেছিল। তার নাম কল্পনা। মা নেই, অভাবে পড়ে বদ পথে না গিয়ে বর খুঁজতে এসেছিল জহর কারখানায়।

কল্পনা কাহিনি এখন থাক। জহর কাহিনি হোক।

জহুরি দণ্ডপথ আমার মনের কৌতূহল মিটিয়ে দিয়েছিলেন হিরে পাথরের অলৌকিক শক্তির উৎস শুনিয়ে। ব্যাপারটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে রেখে শুনে রাখ, ইন্দ্র, আখেরে কাজ দিতে পারে।

ফোর্থ ডাইমেনশন নাকি টাইম। আইনস্টাইন এ রকম একটা আভাস নাকি দিয়েছেন। যাকগে...যাকগে... ভুল হলে শুধরে দিস। জহুরি দণ্ডপথ তিব্বত থেকে চিনেদের চোখে ধুলো দিয়ে, শিখে এসেছেন... অজস্র ডাইমেনশন রয়েছে এক-একটা হীরক খণ্ডের মধ্যে। এক-একটা দিক এক-একটা কিউব... ঘনক... রচনা করেছে হিরের মধ্যে... অনেক ঘনক ভেতরে ভেতরে ঢুকে কল্পনাতীত ডাইমেনশন সমষ্টি রচনা করে রয়েছে... শেষ নেই... শেষ নেই... এক-একটা ডাইমেনশনে এক-একটা শক্তি... সূক্ষ্ম শক্তি... আধুনিক কোয়ান্টাম থিওরি তো সবে বলছে, নটা ডাইমেনশন থাকলেও থাকতে পারে... তিব্বতি জ্ঞানীরা বলছেন–এই ব্রহ্মাণ্ড যেমন অনন্ত, এক-একটা হিরে, তেমনি অন্তহীন শক্তিপুঞ্জের আধার... হীরকশক্তির মূল সূত্রটা এইখানেই।

ইন্দ্র, কল্পনাকে পেলাম, রঙিন হিরেদের সৃষ্টি কীভাবে, তাও জানলাম। তিব্বতি প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম শক্তিদের সংহত করেছেন জহুরি দণ্ডপথ। শুধু জেল্লা দেখানোর জন্যে নয়, বিশেষ বিশেষ শক্তির আধার সৃষ্টি করবার জন্যে...

সেলস টক? হয়তো তাই। হিরে বেচাতে জানেন দণ্ডপথ।

আমি কিন্তু হিরে-বুঁদ হয়ে গেলাম। নন্দিতা, কল্পনা, দণ্ডপথ—এই তিনজনের কাছ থেকে যে জ্ঞান আহরণ করেছিলাম, যে প্রেরণা পেয়েছিলাম—তার তাড়নায় হিরেদের উৎস সন্ধানে টহল দিয়ে গেছিলাম দেশে দেশে... জেনেছিলাম বিস্তর রক্তাক্ত কাহিনি...

অ্যাডভেঞ্চার... অ্যাডভেঞ্চার... অ্যাডভেঞ্চার...

১৭. হিরের খনি! হিরের খনি!

১৭. হিরের খনি! হিরের খনি!

তার আগে শুনে নিয়েছিলাম জহুরি দণ্ডপথের মুখে–হিরে, কত রকমের অভিশাপ টেনে এনো দেশে দেশে, কত রক্ত ঝরিয়েছে… কত রাজ্যের উত্থান আর পতন ঘটিয়েছে…

মানুষটা নিজেই একটা হীরক-ইতিহাস… আশ্চর্য! আশ্চর্য!

শুধু কি তিব্বত, হিরে তাকে টেনে নিয়ে গেছে যেখানে খনি, যেখানে হিরের কারবার… সেইখানে, সেইখানে… কি জানি কেন আমার মতো উজবুককে উনি ‘স্নেহের চোখে দেখে ফেলেছিলেন অথবা কিঞ্চিৎ কৃপাবর্ষণ করেছিলেন–কারখানার কল্পনাকে জীবনসঙ্গিনী করবার পথে পা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলাম বলে… না করেও পারিনি, ইন্দ্র… যা কারও কাছে বলা যায় না, তা প্রিয় বন্ধুর কাছে বলা যায় … কল্পনা আমাকে টেনেছিল কেন? ওর চোখ দিয়ে… ওর চোখ দিয়ে… চিরকাল জুলিয়েটরা রোমিওদের যেভাবে টেনে ধরে… সেইভাবে… যে পন্থায় চুয়া মোহন করেছিল চন্দনাকে… লায়লা-মজনুর কাহিনি রচিত হয়েছে যেভাবে, সেইভাবে… সেইভাবে. .স্রেফ চাহনিবাণ মেরে… মোহন চাহনি দিয়ে আমাকে মগ্ন করে দিয়েছিল… যাচ্চলে… হিরের কথা বলতে বলতে ফের মানবী-হি.লর কথায় চলে এলাম… হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কল্পনা একটা হিরের টুকরো কন্যা…

ভুরু নাচাচ্ছিস? নাচা, নাচা, প্রেমে তো কখনও পড়িসনি… যেদিন পড়বি, বুঝবি কত ধানে কত চাল। কি কথা হচ্ছিল? জহুরি দণ্ডপথ আমাকে স্নেহের চোখে দেখে ফেলেছিলেন। জহুরি যে, মানুষ চিনতে পারেন… আমি অমানুষ নই বলেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন মেকি আর আসলি হিরে কি করে চিনতে হয়… কি করে বালির দানার সাইজের হিরের আটান্ন দিক সত্যিই আছে কিনা, দেখে নিতে হয়…

যা দিয়ে দেখতে হয়, আতস কাচের মতে সেই জহুরি যন্তরটার নাম ইংরেজিতে উপ... অথচ কোনও ইংরেজি ডিক্সনারিতে এ নাম খুঁজে পাইনি...তাতে কিছু এসে যায় না... জহরবিদ্যা বড় বিদ্যা, এ বিদ্যা যায় না মারা... দণ্ডপথ আমাকে শিখিয়ে দিলেন বালির সাইজের খুদে হিরের ঝকঝকে আটান্নটা দিক যাচাই করে নেওয়ার বিদ্যে...হিরেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে নিয়ে ওই লউ-এর ফোকাস মেরে...

আমি তখন হিরে কেনার কারবার শুরু করেছিলাম। একশো আটষট্টিটা বালি সাইজের হিরে কিনেছিলাম... ছ'হাজার টাকা ক্যারাট দামে... খুদে হিরে... খুদে হিরে. এ যুগটা মিনিয়েচার করার যুগ... হির-মিনিয়েচার শিল্প দখলে রেখেছেন দণ্ডপথ নিজের কারখানায়... এক-একটা খুদে হিরের আটান্ন দিক তুলতে সময় লাগে মাত্র তিনঘণ্টা...

তোর চোখ দেখে বুঝছি, ইন্দ্রনাথ, তুই হীরক সমাচ্ছন্ন হয়েছিস... একেই বলে হিরের নেশা... মদের নেশার চাইতেও মারাত্মক... এই নেশায় পাগল হয়ে গিয়ে আমি দেশে দেশে ঘুরেছি... সাউথ আফ্রিকার বিশাল হিরের খনি দেখেছি... আন্টওয়ার্প, নিউইয়র্ক, তেল-আভিভ-এর হিরে কেনাবেচার বাজারে টহল। দিয়েছি... হিরে নিয়ে লড়তে গিয়ে যেসব দেশ ধ্বংস হয়েছে, সেই সব দেশ পরিক্রমা করে এসেছি... কিন্তু সুরাট শহরের মূল ডায়মণ্ড এলাকা ভারাচা রোড-এর মতো হীরক-হাট কুত্রাপি দেখিনি... কি বললি? কুত্রাপি মানে কি? ইডিয়ট... কুত্রাপি মানে, কোথাও, কখনও... আধুনিক বাংলায় গুলি মার... সাধু বাংলা ছাড়া মনের ভাব বোঝানো যায় না...।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে নাকি? আমি নিরুপায়... হিরে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে... হিরে, হিরে, হিরে ... শয়নে স্বপনে জাগবণে উত্থানে এই হিরে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে দেশ-দেশান্তরে... সব লিখতে গেলে একটা মহাভারত লেখা হয়ে যাবে... সুরাটের বুস্টার ডায়মণ্ডস ফ্যাক্টরি দেখবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন জহুরি দণ্ডপথ... আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন সেখানকার দুই মালিক অনুজ আর অক্ষয় মেটা'র সঙ্গে... আশ্চর্য কি জানিস, ইন্দ্র? ...যে বালি হিরে ছ'হাজার টাকা ক্যারাট হিসেবে কিনেছিলাম, দশহাজার টাকা ক্যারাট হিসেবে এদের কাছেই বেচেছিলাম... হিরের দালালিতে সেই আমাব প্রথম লাভ...

তারপর অনেক ঘুরেছি, অনেক শুনেছি, অনেক দেখেছি... একদিনে হইনি ডায়মণ্ড এক্সপার্ট... কঙ্গোর ডায়মণ্ড অঞ্চলে মুবুজি মায়ি খনি দেখেছি, হিরেও। কাসাঞ্জির সঙ্গে দহরম মহরম সম্পর্ক গড়ে তুলেছি ... সেখানকার একখানা

হিবের দাম তিরিশ লক্ষ ডলারে উঠে যাওয়ার পরেও সেই হিরে নিয়ে রক্ত ঝরানো খেলা শুরু হয়ে গেছিল… কঙ্গোয় তখন গৃহযুদ্ধ চলছিল একটানা দু'বছর ধারে. . উভয়। পক্ষই যুদ্ধের খবচ জুগিয়ে যাচ্ছিল হিরে বেচে … মাসে মাতে হিরের কারখানা থেকে আড়াই কোটি ডলার খাজনা আদায় করে যাচ্ছিল গভর্নমেন্ট। আমি আদায় করছিল তোলা—হিরের খনি থেকে হাত মিলিয়েছিল বিপ্লবীরাও। সে এক নয় ছয় কাণ্ড।

দু'হাজার সালের আগস্টে কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট নিরুপায় হয়ে, যুদ্ধের খরচ জোগাতে, হিরের খনির এক্সকুসিভ রাইট বেচে দিয়েছিলেন ইজরায়েলের একটা কোম্পানিকে দু'কোটি ডলারে। কাসাঞ্জির রত্নখনি থেকে হিরে স্মাগলিং শুরু হয় তখন থেকেই—চলে যায় বর্ডারের ওপারে।

শুরু হয়েছিল হীরক যুদ্ধ। বহু আগে যেমনটা হয়েছিল এই ভারতে। অ্যাংগোলান বিপ্লবী সাভিমবি আকাটা হিরে সাপ্লাই দিয়ে গেছে হরদম, ইউনিতা অনি পাঠিয়ে দখল করেছে কুয়ানগো উপত্যকার হিরের খনি… যার দাম চার বিলিয়ন ডলার। হিরে অভিশাপে মরতে বসেছিল অ্যাঙ্গেলা রক্তাক্ত হিরে নিয়ে লড়াই শুরু হয়েছে আফ্রিকার অন্য অন্য অঞ্চলেও… শুরু হয়েছে হিরে লুঠ… সাঙ্কো সৈন্যরা অসহায় কারিগরদের লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে হাত আর পা কেটে দিয়েছে—দেশের লোককে ভয় দেখাতে… বাচ্চাদেরও বাদ দেয়নি… নরপিশাচ… মানুষখেকো… এই ভাষায় খবর বেরিয়ে গেছিল 'নিউইয়র্ক পোস্ট' কাগজে ১৯৯৯ সালে… ইন্দ্র, পড়ে নিস… যদি এখনও অবিশ্বাস থাকে অভিশপ্ত হিরে বাণিজ্যের কাণ্ডকারখানায়। নেলসন ম্যাণ্ডেলা তো বলেইছিলেন-হিরে বয়কট করলে বোটসওয়ানা আর নামিবিয়ার অর্থ ব্যবস্থা… আই মিন, ইকনমি ভেঙে পড়বে। আমেরিকান কংগ্রেস আইন প্রণয়ন শুরু করেছিল ক্লিন ডায়মণ্ডের সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারে—যে হিরেতে লেগে নেই রক্ত… লেগে নেই চোখ ধাঁধানো হিরের নেকলেসে।

এত সত্ত্বেও, এত রক্তাক্ত ব্যাপারের পরেও, হিরে পরশ পাথর হয়ে রয়েছে বহুত মানুষের কাছে।

অভিশপ্ত পাথর কিছু মানুষের কাছে। আমার এই কাহিনির অবতারণা সেই জন্যেই… হিরে মানুষকে অমানুষ করে তোলে… ছেলেদের পিশাচ আর মেয়েদের পিশাচি বানিয়ে দিতে পারে।

ইন্দ্র, কল্পনা এই হিরে বাণিজ্যে গা না ভাসালেই ভাল করত। তাই ওকে আমি তুলে এনেছিলাম সুরাট থেকে বিয়ে করেছিলাম। ডায়মণ্ড কমপ্লেক্স গড়ে তুলেছিলাম ব্যাঙ্গালোরে। তবে হ্যাঁ, ওর ব্রেন আমাকে হেল্প করেছিল… এখনও করছে…

তারপর? ‘ উধাও হয়ে গেল হিরের ডিম।

১৮. পাথরের মন্ত্রশক্তি আর ক্রিস্টাল কুহেলিকা

১৮. পাথরের মন্ত্রশক্তি আর ক্রিস্টাল কুহেলিকা

ইন্দ্র, আমি বুঝতে পারছি, তোর হিরে-চোখের চাঞ্চল্য দেখে টের পাচ্ছি, তুই অধৈর্য হচ্ছিস। কিন্তু হে বন্ধু, আমার মুখের আগল যখন খুলে যায়, তখন যে। উনপঞ্চাশ পবনের ধাক্কায় ফুলে ওঠে মনবজরার পাল। সুখ-দুঃখের এলোমেলো। ভিড়ের কথা উপছে ওঠে মনের মতো দোস্তের কাছেই। এই জীবনের গিরিপথের নানা পাথর-নুড়ির মধ্যে আচমকা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম একটা হিরে। সে আমার কল্পনা… সে আমার কল্পনা… পাহাড়ের মেয়ে কল্পনা… আশ্চর্য এক পাথরে গড়া তার মন… কখনও কোমল… কখনও কঠিন…

আমি যেন কি রকম হয়ে গেছিলাম তার সবুজ পাথর চোখ… অথচ পাথরের মতো নিষ্প্রাণ নয় সেই চোখ… যেন সবুজ আকাশ… অন্য এক গ্রহের অন্য এক আকাশ… সবুজ… সবুজ… সবুজ…।

আমার মোহাবিষ্ট চোখ দেখে মৃদু হেসে জহুরি দণ্ডপথ বেশ কিছু উপদেশ মন্ত্র আমার কানের মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলেন। জাত জহুরি তো… পাথর দেখে চেনেন… মানুষ দেখে বোঝেন… বিশেষ করে মেয়েমানুষ…

হাজারো কথার মধ্যে একটা ব্যাপার আমার মাথার মধ্যে কথার পেরেক ঠুকে ঠুকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাপুহে, হিরে যখন তোমাকে টেনেছে, ওষুধের কারবারে থেকেও হিরের কারবার নিয়ে মেতেছ, তখন একটা ব্যাপার সদা জাগ্রত রাখবে তোমার মনের পটে। ব্যাপারটা মানব মনের মূল প্রকৃতি নিয়ে —হিরের টান এড়াতে পারে না। হিরে একটা ক্রিস্টাল প্রহেলিকা… ভাগ্যবিধাতার সেরা সম্পদ। প্রচ্ছন্ন থাকে হিরের ক্রিস্টাল দুর্গে… হিরে হাতে নিয়ে তাই হাতছাড়া করতে চায় না কোনও মানুষ… রাখতে চায়… সঙ্গে সঙ্গে… হিরের মন্ত্রশক্তি যেন ঘুরিয়ে দেয় তার ভাগ্যচক্র… মনোরথ ধেয়ে যায় চক্রনির্দিষ্ট বিজয় পথে…

ইন্দ্র, জহুরির এত কথার কাব্য আমার মাথায় ঢোকেনি। আমি চিরকাল নীরস, কাঠখোট্টা। তাই পষ্টাপষ্টি জানতে চেয়েছিলাম, হিরের আবার মন্ত্রশক্তি কি? হিরে তো একটা পাথর।

চোখ নাচিয়ে হাস্য করেছিলেন জহুরি দণ্ডপথ। অট্টহাস্য নয়, মৃদু হাস্য। যাকে কবি-বিরা বলে স্মিতহাসি! বৃদ্ধের কেউ নেই। না পুত্র, না কন্যা, না ঘরণী। হিরে ছাড়া তাঁর দুনিয়ায় আর কিছু নেই। আমাকে তার হিরে চোখ দিয়ে দেখেছিলেন, হিরে চোখ দিয়ে মেপেছিলেন, হিরে চোখ দিয়ে কাছে টেনেছিলেন, হিরে চোখ দিয়ে বিশ্বাস করেছিলেন।

তাই, ইন্দ্রনাথ, অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি, হিরের গুপ্ত শক্তিব গোপন মন্ত্র অর্পণ করে গেছিলেন শুধু আমাকেই। হয়তো… না, না, হয়তো কেন, উনি নিশ্চিতভাবে জানতেন ওঁর শেযদিন আর দূরে নেই, তাই মন্ত্রশক্তির মহাকথা বলে গেছিলেন শুধু আমাকে…

জেনেছিলেন তিব্বতের যে পর্বত কন্দর থেকে, যে গুম্ফার গায়ে পাথরে আকীর্ণ সংস্কৃত মন্ত্রশ্লোক থেকে, সেই গুম্ফা এখন পৃথিবীর জঠরে।

তিব্বত যে গুটিয়ে যাচ্ছে… সরে যাচ্ছে এশিয়ার দিকে… বছরে বত্রিশ মিলিমিটার হিসেবে… সরছে ইণ্ডিয়ান প্লেট–গ্লোবাল পজিসনিং স্যাটেলাইটের হিসেবে…

অন্য কথায় চলে যাচ্ছি… বিজ্ঞানের কথা এখন থাক… আসুক অপবিজ্ঞান … যুক্তি বিজ্ঞানের ধ্বজা তুলে যারা পাড়া মাতাচ্ছে… অপবিজ্ঞান শব্দটা তাদের কাছ থেকে ধার করে এনে তো শোনালাম। যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, তা তো অপবিজ্ঞান। হোক… মন্ত্র রচনার যুগে জন্ম হয়নি যে হিরে পাথরেব, অযুত নিযুত শক্তি। আধার সেই হিরে পাথরের শক্তিকে জাগ্রত করা যায় যে মন্ত্রশক্তি দিয়ে, জনি। দণ্ডপথ আমাকে তা শিখিয়ে দিয়ে গেছিলেন… তারপর আচমকা দেহ রেখেছিলো।

রসময় রহস্যের সে কথা আসবে পারে। এখন শোনা হিরেকে জাগাতে হয় কী করে। কিন্তু, হে বন্ধু, এ কথা যেন পাঁচকান না হয়, তত্ত্ববিজ্ঞানীরা… যাকে তোরা বলিস অকাল্টসায়েন্টিস্ট … পরাবিজ্ঞানী… তারা কিন্তু লাফিয়ে উঠেছিলেন, হীরক শক্তি জাগরণের পন্থা-প্রকরণ জানবার জন্যে আমার পেছনে আঠার মতো

লেগেছিল... কাউকে বলিনি... কাউকে বলিনি... সবাই তো অব ইন্দ্রনাথ রুদ্র নয় সে যে একটা সচল সিন্দুক!

ইন্দ্র, সুনামির বিধ্বংসী ক্ষমতার আভাস কিন্তু টের পেয়েছিল মনুষ্যেতর প্রাণিরাতাদের দৌলতেই আন্দামানের অনুন্নত মানুষবা কেউ মরেনি। পালিয়ে বেঁচেছিল। তাহলে তো দেখাই যাচ্ছে, অত্যুন্নত মানুষ যন্ত্রবিজ্ঞানের দৌলতে যে প্রলয়ঙ্কর। শক্তির পূর্বাভাস ধরতে পারে না, জীবজন্তু প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতায় তা জেনে ফেলে।

তাহলে, অদৃশ্য জগতে এমন কিছু আছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যশালায় এখনও ঠাঁই পায়নি... কিন্তু আছে, আছে, সেই সব শক্তি বিলক্ষণ বিদ্যমান রয়েছে... জেনেছে পরাবিজ্ঞান... প্রাচীন বিজ্ঞান... গুপ্ত বিজ্ঞান... গুহ্য থেকে গেছে সেকালের তত্ত্ববিজ্ঞানীদের গোপনীয়তার দরুন।

এই ব্যাপারটা নিয়েই প্রথমে একটা ছোটখাটো লেস্টার দিয়েছিলেন জহুরি দণ্ডপথ। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ জানি, তাই অল্পবিদ্যার দৌড় দেখাতে যাইনি। জানি বলে যে-জন করে অভিমান, কিছুই জানেনি তারা, জেনেছে যে-জন সেজন জানিবে হয়েছে বাক্যহারা। আমি যে একটা নাথিং, এই জ্ঞান যার থেকে, সে কিন্তু সামথিং জানতে পারে। যে বলে আমি জানি এভরিথিং, সে একটা নট, মানে, জিরো।

তোর অসীম ধৈর্যের তারিফ না করে পারছি না, ইন্দ্র। আমার এত বকুনি যে একটা মস্ত আশ্চর্য বিষয়ের গৌরচন্দ্রিকা, তা তুই তোর মিনিশন, আই মিন, পূর্বাভাস-জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করেছিস।

তাহলে এখন আসা যাক হিরে প্রসঙ্গে। জ্যোতিষশাস্ত্র যা জানে না, সেই প্রসঙ্গে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বাইরে রেখে যা উদ্ভট এই তত্ত্বকে।

কাগজ কলম কোথায়? এই যে... এই আঁকছি একটা নক্ষত্র—এক টানে। কলম না তুলে।

লক্ষ্য করেছিস নিশ্চয়, কলম যেখানে বসালাম, সেখান থেকেই তুললাম। পাঁচ পয়েন্টের নক্ষত্র। তার ওপারে, নক্ষত্রের ডগায় ডগায় পাঁচ পয়েন্ট ছাড়াও, ভেতরে ভেতরে রয়েছে আরও পাচটা পয়েন্ট। বুঝলি না? বুঝিয়ে দিচ্ছি…

মোট দশটা পয়েন্ট পাওয়া গেল। দশটা বিন্দু। বিন্দু রহস্যের সূত্রপাত এইখান থেকেই। শক্তির দুর্গ। এ শক্তির আদি নেই, অন্ত নেই। অজানা অনন্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে এই দশটা বিন্দুতে। এইবার আহরণ করতে হবে এই বিন্দু শক্তিকে—দশ বিন্দুতে দশটা হিরে বসিয়ে।

কীভাবে? গুপ্ত প্রকরণ এইখানেই, কিন্তু খুব সোজা। জহুরি দণ্ডপথের কাছে আগেই জেনেছিলাম, জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছিলাম, মোট ন'রঙের ন'টা হিরে তার কাছে আছে—সাদা আর কালো প্লাস বর্ণালির সাত রঙের সাতটা হিরে… মনে পড়ছে?

উনি ন'টা পয়েন্টে বসালেন ন'খানা হিরে… দশম বিন্দু তখন হিরেহীন …আমার চোখে চোখে চোখ রেখে বললেন, শক্তিস্রোত বইছে ন'টা হিরের মধ্যে দিয়ে… সূক্ষ্ম শক্তি… বর্ণশক্তি. আটকে আটকে যাচ্ছে দশম বিন্দুতে…ওই বিন্দুতে এখন যে হিরে বসানো হবে… গুপ্তশক্তির আধার হয়ে দাঁড়াবে সেই হিরে…।

ইন্দ্র, এই মুহূর্তে তোর চোখে যে অবিশ্বাস দেখছি, আমার চোখেও সেই অবিশ্বাস দেখতে পেয়েছিলেন গুহ্যতত্ত্বজ্ঞানী জহুরি দণ্ডপথ। রাগ করেননি। দশম হিরের

দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে দশবার একটা উৎকট সংস্কৃত মন্ত্র জপ করে গেছিলেন—আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে... আমার তা মুখস্থ হয়ে গেছে... কিন্তু তোকে তা বলতে পারব না... কথা দিয়েছি গুরু দণ্ডপথকে... পা ছুঁয়ে শপথ করেছি... তবে তুই প্রাণের বন্ধু... কাব্য দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি... মন্ত্রশক্তির যে অনুকম্প... ভাইব্রেশন... শব্দশক্তি. বিপুল এনার্জি... তা থাক শুধু আমার মগজে...

অধৈর্য হয়েছিস? তবে শোন আনাড়ির কবিতা...,

সাত রঙের ছটা...
খেলেছে নাচের উড়নিতে...
নবম দশা পেয়েছে আমার মন্ত্রশক্তিতে...
দশম পাথর ভিন্ন তখন মহাশক্তিতে।

ছন্দ মিলল না? দুঃখিত। আমি কবি নই। কিন্তু এটা তো জানিস, নয় সংখ্যাটা হিব্রু সংখ্যা বিজ্ঞান অনুযায়ী অসীম শক্তিধর? সেই শক্তি চলে আসে দশম বিন্দুর হিরেতে... তখন, ইন্দ্র, শুধু তখন, ভাগ্যবিধাতার সেরা সম্পদ... নিয়তির নতুন লিখন হীরকের ক্রিস্টাল পুর্গে প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। সেই হিরে যার অধিকারে আসে, সে হয় অসীম শক্তিধর। হিরে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ঘটে গেছে যুগে যুগে এই কারণেই... পাওয়ারফুল হিবেদের শুধু জবরদখল করে রাখলেই হয় না... তাদের শক্তি ভাঙানোর প্রক্রিয়াটাও শিখতে হয়...ইন্দ্র, আমি সেই প্রক্রিয়া জানি... জানি বলেই কোনও পুঁজি না নিয়ে আমি আজ ডায়মণ্ড কমপ্লেক্সের মালিক... নখানা। পাথবের ডিমের দৌলতে।

পাথরের ডিম বৃত্তান্ত তোকে বলা হয়নি? গুছিয়ে বলার ক্ষমতা আমার নেই—তোর মতো। এখন বলছি-পাঁচ কান যেন না হয়। সাত রঙের বালির সাইজের হিরে আমাকে দেখিয়েছিলেন জহুরি দণ্ডপথ, মনে আছে? উনি সেই রঙিন হিরেদের রেখে দিতেন পাথরের ডিমের মধ্যে... পেশোয়ারের পাথর কারিগরের গড়া পাথরের ডিম... দেখতে হাঁসের ডিমের মতো... তবে সাদা নয়... সারা গায়ে পাথরের রেখা ... এমনভাবে গড়া যে পেঁচিয়ে খুলে ফেলা যায়... রেখাগুলো ঢেকে রেখে দেয় প্যাঁচের দাগ... এ ছাড়াও অবিকল ওই রকম আরও দু'টো ডিমের মধ্যে রাখতেন সাদা আর কালো হিরে... বালির সাইজের হিরে... দশম হিরোকে তুক... ইয়ে..., মন্ত্রপূত করে শক্তিধর করার জন্যে...

শিক্ষা সমাপ্ত করাব পর উনি ন’খানা হিরেই আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কল্পনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার পর… বিয়ের যৌতুক অথবা পণ হিসেবে… যা খুশি বলতে পারিস…

কিন্তু যে রহস্যটার আজও কোন কিনারা করতে পারিনি, তা তোকে আগে বলেছি… মানে, ছুঁয়ে গেছি…

পরের দিন সকালে জহুরি দণ্ডপথের শরীরটা পাওয়া গেছিল বিছানায়… কিন্তু প্রাণ ছিল না সেই শরীরে…

হে পাঠক, হে পাঠিকা, প্রায় দম বন্ধ করে শুনে গেছিলাম রবি বের অবিশ্বাস্য কাহিনি। ন’টা পাথরের ডিম যে তার হেপাজতে… জেনেছিলাম তখনই।

তার অনেক… অনেক পরে… ছ’খানা ডিম হল নিরুদ্দেশ। নিপাত্তা। নিখোঁজ। আর তার ঠিক পরেই বিয়ে ভেঙে গেল রবির। ছেলেকে নিয়ে আলাদা নীড় রচনা করেছিল কল্পনা। এক পয়সাও খোরপোস না নিয়ে। আমার দিকে কল্পনাব সবুজ চোখের লেহন শুরু হয়েছিল এর পর থেকেই। কিন্তু সে অনেক পরের কথা… যদিও সেই ব্যাপার দিয়েই শুরু হয়েছে এই কাহিনি।

১৯. উৎকণ্ঠার মন্ত্র আর মত্ততার নৃত্য

১৯. উৎকণ্ঠার মন্ত্র আর মত্ততার নৃত্য

কল্পনা নাম্নী কন্যা যে বিশেষ কঠিন পদার্থ দিয়ে নির্মিত, এই তত্ত্ব আহরণ করতে বিলক্ষণ সময় লেগেছিল রবি রে নামক দুদে সেলসম্যানের। যে নাকি মানুষ চরিয়ে খেয়েছে, দেশে দেশে ঘুরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, তার মতো চৌকস সেয়ানা ধুরন্ধর চক্ষুষ্মন ব্যক্তিকেও ঘোল খাইয়ে দিয়েছে এই কল্পনা… কল্পনা চিটনিস।

প্রিয় বন্ধু বলেই প্রথম মধুরাতের মধুকথা আমার কানে যৎকিঞ্চিৎ উপুড় করেছিল রবি। সখীদের নিয়ে, হীরক, কারিগর বান্ধবীদের নিয়ে, কল্পনা সেই রজনীতে রমণ নৃত্য নেচে গেছিল রবির সামনে।

রমণীয় শব্দটাকে ইচ্ছে করেই একটু ছোট করলাম—এক কথায় লাখো কথা বলার জন্যে।

জহুরি দণ্ডপথ মানুষটা ছিলেন সত্যিই হিরের টুকরো। এই সংসারের পাথর-নুড়ির মধ্যে এমন হিরের কণা আচমকা এসে যায় বরাতে। রবি রের বরাত এই দিক দিয়ে বিরাট। জহুরি দণ্ডপথ হিরে চেনেন। তাই রবি নামক হিরের টুকরোকে বেছে নিয়েছিলেন। যে মন্ত্র কানে কানে বর্ষণ করেছিলেন, তা যুণ যুগ ধরে আতীব্র উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করে গেছে মন্ত্রধারীদের মনের মধ্যে। ব্যতিক্রম ছিলেন ” জহুরি দণ্ডপথ। তিনি দাবপরিগ্রহ করেননি। চিরকুমার। এবং জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু হয়তো অনুক্ষণের উৎকণ্ঠার নিরসনের জন্যে নিশীথে শয়নকালে কিঞ্চিৎ অহিফেন সেবন করে যেতেন। নিয়মিত মাত্রা ছাড়িয়ে।

কল্পনার লকেট রবি রের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়ার আগে, বৈদিক বিবাহের মাধ্যমে, কানে কানে অনা মন্ত্র শুনিয়ে গেছিলেন আশ্চর্য এই বৃদ্ধ। যার সংক্ষিপ্তসার-বস

রবি, যে মন্ত্র তোমাকে দান করে গেলাম, এ মন্ত্র তুমি দান করবে শুধু তোমার ঔরসজাত সন্তানকে।

রবি অবাক গলায় বলেছিল—তাহলে আমাকে শেখালেন কেন?

বৃদ্ধ বলেছিলেন, কারণ তুমি আমার পূর্বজন্মের পুত্র।

আপনি জাতিস্মর?

নিগুঢ় হেসেছিলেন জহুরি দণ্ডপথ। বলেছিলেন, বেশি জানতে চেও না। আশীর্বাদ করছি, রহস্যে রহস্যে রসময় হোক তোমার জীবন। নিজেই উদ্ধার করবে অনেক গুপ্তজ্ঞান। কিন্তু সাবধান। যা জানবে, তা পাঁচ কান করবে না। কল্পনার কানেও ঢালবে না।

এই বাণী তিনি রবির কানে বর্ষণ করেছিলেন মধুরাত শুরু হওয়ার কিছু আগে। শুতে চলে গেছিলেন—যথারীতি অহিফেনের কৌটো হাতে নিয়ে।

আর, রঙ্গিণী নৃত্য শুরু হয়েছিল তারপরেই। কল্পনার কাজের সহচরীরা গানে আর নাচে মাতিয়ে তাতিয়ে দিয়েছিল রবিকে। সেই আসরে আলো ছিল নিভু নিভু, কিন্তু আলো জ্বলছিল প্রতিটি মেয়ের চোখে। বুঝি নক্ষত্র ঝলসে যাচ্ছিল প্রতি কন্যার কটিদেশের রত্ন আভরণে—প্রায় অনাবৃত চারু অঙ্গের প্রতিটি প্রদেশ ঝলকিত হচ্ছিল উদ্দাম উচ্ছল উদ্বেল নৃত্যের বিপুল ছন্দের মহাতালে। রঙ্গিণীদের কেন্দ্রে ছিল স্বয়ং কল্পনা। বরতনুতে আভরণ যত ছিল, আবরণ ছিল না সেই অনুপাতে। চকিত কটাক্ষের অব্যক্ত চাহিদা ফুটে ফুটে উঠছিল, ঠিকরে যাচ্ছিল প্রতিটি স্পন্দিত রোমকূপ থেকে। ফুলে ফুলে উঠছিল নাকের পাটা-নাসিকারন্ধ্রে বয়ে যাচ্ছিল বসন্তবনের হরিণীর দীর্ঘনিশ্বাস… গানে আর কথায়, উল্লোল ছন্দ। আর দেহভঙ্গিমায় যেন বলে যাচ্ছিল কল্পনা—আমি বীর্যবতী, আমি বীরভোগ্যা, ডান হাতে নাও আমার সুধা, বামহাতে চূর্ণ করো আমার দেহপাত্র… অট্টহেসে পূর্ণ করো আমার শূন্য গর্ভ… ও গো মধুপ্রিয়… পান করো আমার শরীরের মধু… আদিম বর্বরতায় কঠিন হোক তোমার শরীর … নিষ্ঠুর নিপীড়নে নিংড়ে নাও আমাকে…ঝড় হেঁকে উঠুক তোমার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, কামনার ঘূর্ণিপাকে এসে যাও তুমি আমার মাঝে… তোমার শরীরের লৌহদূর্গে আমি হতে চাই বিবরবাসী… বাজুক দামামা তোমার রুধিরে পেশিতে… মেতে যাও নির্মাণ

নেশায়… ঝংকারে টংকারে ক্রেংকারে হুঙ্কারে মত্ততার এই নৃত্যের অবসান ঘটুক মহামিলনে।

মধুরাতের এ রকম প্রলাপ পাঠক এবং পাঠিকার অজানা নয়। যুগ যুগ ধরে এমন মধু মত্ততা চলে আসছে বিয়ের বন্ধনে নর এবং নারী কাছাকাছি হওয়ার পর থেকেই। ফুলকিতে ফুলকিতে স্কেয়ে যায় উভয়ই… দাবানলের পর আসে প্রশান্তি…

রবি বললে, ইন্দ্র, আমি হিসেব করে দেখেছি, সেই রাতেই আমি বাবা হওয়ার বীজ বপন করেছিলাম।

আমি অট্ট অট্ট হেসে বলেছিলাম-হে বীর, লহ মোর প্রণাম।

রবি বললে, এসব কথা সবাইকে বলা যায় না। তুই একটা উঁাড়শ, তাই বললাম। পরের দিন সকালে দেখা গেল জহুরি দণ্ডপথ বডি ফেলে রেখে পালিয়েছেন।

আফিং বেশি খেয়ে?

কি করে বলি? ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে তো কোনও কথা ওঠেনি। আমি খবর পেয়েই দৌড়েছিলাম।

রণক্লান্ত যোদ্ধার মতো?

নো ইয়ার্কি, মাই ফ্রেণ্ড। ঘরে ঢুকে দেখলাম, প্রশান্ত মহিমায় দেহত্যাগ করেছেন এ কালের ভীষ্ম। ব্রহ্মতালুর কাছে উড়ছে মাছি। চোখের পাতা খোলা।

একটু থেকে আমি বললাম, তারপর?

তারপর?

গুম হয়ে গেছিল রবি। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়নি। আমি গুঁতিয়ে গেছিলাম—ডিম চুরি হল কবে? কীভাবে?

থেমে থেমে সেদিন যা বলেছিল রবি, তা নিগূঢ় রহস্যে আবৃত এক কষ্ট-কাহিনি।

২০. কী ছিল পাথরের ডিমে?

২০. কী ছিল পাথরের ডিমে?

ইন্দ্র, জহুরী দণ্ডপথ জীবন্ত জহর ছিলেন বললেই চলে।তিব্বতের মন্ত্র উনি আমাকে দান করেছিলেন, জহুরী চোখ দিয়ে কল্পনাকে যাচাই করে নিয়ে আমার জীবনসঙ্গিনী করে দিয়েছিলেন, আর… আর… আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছিলেন…

হিরে চরিত্র যেমন ছিল তার নখদর্পণে, তেমনিই নারী চরিত্র ছিল না তার অজানা… সেই কারণেই হয়তো ঘরণী আনেননি ঘরে… কুবেরের মন্ত্র সংগুপ্ত রেখেছিলেন মনের কদরে…কিন্তু জীবন যখন ফুরিয়ে আসছে,তখন উপলব্ধি করেছিলেন একটা মহাসত্য… মানবজীবনের মোদ্দা কথাটা কী?… ধারাবাহিকতা… বহমানতা… দিয়ে যাও… হাত বদল করে যাও… শিক্ষক দিক ছাত্রকে… পিতা দিক পুত্রকে… আমরা, এই মানুষরা, দিতে দিতেই চলে যাই… দিতেই হয় ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।

আমি দার্শনিক হয়ে পড়ছি। বিল ক্লিনটনের একটা কথা মনে পড়ছে। স্মৃতির বোঝা যখন স্বপ্ন দেখার ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায়, মানুষ তখনই বৃদ্ধ হয়। আমিও বোধহয় বুড়িয়ে যাচ্ছি। এত স্মৃতি ভিড় করে আসছে মনের মধ্যে… অথচ কত কাজ এখনও বাকি…..

বন্ধুর কাছে মন হালকা করতে গিয়ে একটু-আধটু অপ্রাসঙ্গিক কথা তো বলবই। অথচ, একেবারে সঙ্গতিবিহীন নয়। ইন্দ্র, তোর ঘটে বুদ্ধি আছে। তুই বুঝবি।

আমি পলিটিক্স এড়িয়ে চলি। কিন্তু কল্পনা, আমার কল্পনা, শয্যায় যে শরীরী প্রহেলিকা… সংকটে যে মহাসচিব… সেই কল্পনাকে টেনে ধরেছিল পলিটিক্স…

পলিটিক্স! ইন্দ্র, আমি ডিক্সনারির পর ডিক্সনারি হাতড়ে পলিটিক্স শব্দটার আসল মানে খুঁজে বেড়িয়েছি। জেনেছি, শব্দটা আসলে দুটো আলাদা শব্দের সংযুক্তি... পলি মানে অনেক, টিক্স মানে ব্লাডসাকারর্স... রক্তশোষকবাহিনি...

এই পলিটিক্স এমনিতেই আমার কাছে বিভীষিকা... দূরে দূরে থাকি. কিন্তু একটু আঁচ তো গায়ে লাগবেই... বিশেষ করে ঘরণী যদি ব্লাডসাকারদের খপ্পরে গিয়ে পড়ে...

ধৈর্য হারাসনি, প্লীজ। ভেতরের এত কষ্ট আর কাকে বলব?

কল্পনা পাথরের দেশের মেয়ে। সে ত্রাটক যোগ জানে, চোখে চোখে সম্মোহন করতে পারে... আমাকে ছাড়া... একটু ভুল হল... একবারই টেনেছিল আমাকে... সবুজ চোখের বাণ মেরে... প্রথম দর্শনেই মরেছিলাম... তারপর থেকে হুঁশিয়ার হয়েছিলাম... ওর তৃতীয় চোখের দিকে তাকিয়ে দুই ভুরুর মাঝের অদৃশ্য ত্রিনয়নের দিকে তাকিয়ে মনের কথা ধরতে চেষ্টা করে যেতাম... তাই... ইন্দ্রনাথ... তাই। আমাকে ঘায়েল করতে পারেনি কল্পনা... পাথরের দেশের মেয়ে কল্পনা... শয্যায়। যে রক্তমাংসের বিদ্যুৎ বল্লরী. সেই কল্পনা...

ইন্দ্র, তুই জানিস... নিশ্চয় জানিস... জগত জুড়ে সন্ত্রাসের জাল ছড়িয়ে পড়েছে আজকাল... এর মধ্যে ধর্মের গন্ধ ছড়ানো রাজনৈতিক উসকানি আছে... সাম্রাজ্যবাদের অভিপ্রায় নিয়ে দূরাত্মা দমনের অছিলায় পরদেশ দখলের মতলববাজি আছে...

তোর কপালে বিরক্তির ভাজ পড়ছে দেখতে পাচ্ছি। তাই বিশদে আর গেলাম না। কামরূপ কামাখ্যার মেয়ে যার মা, সে যে শেষকালে মাতাহারি হয়ে যাবে, এটাই স্বাভাবিক।

কল্পনা হিরের লেনদেনে হাত মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করে যেতে আরম্ভ করেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে... আবার বলছি, ও পাথরের দেশের মেয়ে... তার ওপরে হিরে পাথরের কারবারে জড়িয়ে গিয়ে জেনেছে এক তাঞ্চল... এক দেশ থেকে... আর এক অঞ্চল্ল আর এক দেশে কারেন্সি কীভাবে যায়... হিরে রূপে... মনে পড়ছে? রক্ত ঝরেছে দেশে দেশে... ঝরছে এখনও... কল্পনাতীত অর্থের জোগান। দিয়ে যাচ্ছে হিবে... পাথর রূপী মুদ্রা...

পলিটিক্স... রক্তচোষাদের খপ্পরে পড়ে কল্পনা নজর দিয়েছিল আমার হিরে বাণিজ্যের দিকে। আমি তো হিয়া কামাল হুঁয়া করতাম... এখনও করি... একদামে কিনি, আর এক দামে বেচি... কোথায় সারপ্লাস হিরে... আর কোথায় হিরে মুদ্রার। বড় দরকার, এ খবর আমার মগজে থাকে... কমপিউটারে নয়... যন্ত্রকে আমি বিশ্বাস করি না... আমার বোধহয় মেক্যানোফোবিয়া আছে... হাইটেক ক্রাইমে দুনিয়া ছেয়ে গেছে... ই-মেল, ইণ্টারনেটকে তাই বিশ্বাস করি না... খবরের খনি আমার এই মগজ...।

বেশি বকছি? ক্ষমিও মোরে। কষ্টের কথা প্রিয় বন্ধুকেই বলা যায়। তোকে আগে বলেছি, জহুরি দণ্ডপথ আমাকে ন'টা পাথরের ডিম দিয়েছিলেন। নক্ষত্র এঁকে ন'টা পয়েন্টে বসানোর জন্যে। কাউকে তা বলিনি। কল্পনাকে তো নয়ই। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। তাছাড়া গুরুদেবের নিষেধ ছিল। চুটিয়ে হিরে চালান করে যখন টু-পাইস কামিয়ে যাচ্ছি, একটা অদ্ভুত আর আশ্চর্য খবর চিন্তায় ফেলার মতো খবর, আমার কানে এল।

স্বস্তিকা দেখেছিস? এই চিহ্ন আদতে হিন্দুদের অতি সৌভাগ্য চিহ্ন না, জার্মানদের আদি সৌভাগ্য প্রতীক, এই নিয়ে তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠেছে এখন। আমি সেই ঝড়ের মধ্যে ঢুকছি না, হিন্দুদের স্বস্তিকা এইরকম—
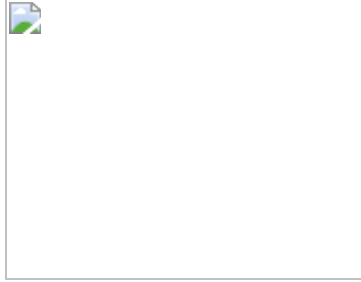
এই স্বস্তিকার মধ্যেও দ্যাখ, ন'টা পয়েন্ট আছে। আচ্ছা... আচ্ছা... দেখিয়ে দিচ্ছি...

স্বস্তিকা শুভশক্তিকে হিরের মধ্যে সংহত করা যায়, আর সেই শক্তিমান হিরে দিয়ে অনেক অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়—এই বিশ্বাসটা এসে গেছে বিশেষ একটা গুপ্ত সমিতির মধ্যে… না, না, সেই সমিতির নাম আমি বলতে পারব না… এই রক্তশোষকদের নাম যত অজানা থাকে, ততই পৃথিবীর মঙ্গল…।

ইন্দ্র, খুব কষ্টের সঙ্গে বলছি, কল্পনা এই গুপ্ত সমিতিতে ভিড়েছে… অথবা গুপ্ত সমিতি কল্পনাকে টেনেছে…।

ফলটা দাঁড়াল কী? স্ত্রী যদি মনে করে, স্বামীর ওপর গোয়েন্দাগিরি করবে, কেউ তা রোধ করতে পারে না… খোদ মহাদেবও ভড়কে গেছিলেন পার্বতীর দশরূপ দেখে… মেয়েরা মনে করলে সব করতে পারে… সব করতে পারে… গড়তে পারে… ভাঙতে পারে… অবলীলাক্রমে…

তবে কেন কল্পনার সঙ্গে আমার গাঁটছড়া বেঁধে দিয়ে গেছিলেন জহুরি দণ্ডপথ? অবশ্যই কল্পনাকে টাইট রাখার জন্যে… ভেঙে গড়বার জন্যে… উপাদান তো ভাল…

যাক গে… যাক গে… আবার ছেঁদো কথায় চলে আসছি…

স্বস্তিকা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। লক্ষ্য করেছিস নিশ্চয়, এই চিহ্নে নবম বিন্দুটা উত্তম হিরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর… আর, এই হিরে যে ধারণ করবে, সে শুভ শক্তি পরিবৃত থাকবে…

কল্পনার নজর গেল জহুরি দণ্ডপথের দেওয়া নখানা পাথরের ডিমের দিকে—যার মধ্যে আছে ন রঙের হিরে… বালি সাইজের…

ইন্দ্র, তুই আমার প্রাণের বন্ধু, হেজিপেজি মানুষ নস, পেটে কথা রাখতে জানিস, তাই তোকে একটা গুপ্ত খবর বলে রাখি…

আগেই বলেছি, জহুরি দণ্ডপথ এই পাথরের শূন্যগর্ভ ডিমগুলো আনিয়েছিলেন পেশোয়ার থেকে। অনিক্স পাথরের ডিম। কিন্তু নিরেট নয়! ফোঁপরা। প্যাঁচকাটা।

আমি নেমে গেছিলাম এই ট্রেডিংয়ে। হিরে আনা, হিরে বেচা। খনির হিরে এ-বর্ডার, সে-বর্ডার পেরিয়ে পেশোয়ারে ঢুকে, অনিক্স পাথরের ডিমের মধ্যে থেকে,

চলে আসত আমার কাছে। আমি বিরাট লাভ রেখে সেই হিরে…অকাট্য। হিরে… চালান দিতাম ঠিক ঠিক জায়গায়… প্রফিট? কল্পনায় আনতে পারবি না…

হিরের গুদোম ছিল ব্যাঙ্গালোরেই… একটা হাই-টেক ইস্পাত সিন্দুকে… সে সিন্দুকের পাল্লা খুলে যেত শুধু আমার ডানহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ সিন্দুক খোলার সঙ্কেতের সঙ্গে মিলে গেলে… খুঁটিয়ে বলতে চাই না… শুধু বুড়ো আঙুলটা বিশেষ একটা জায়গায় চেপে ধরলেই কাজ শুরু হয়ে যেত… সিন্দুকের প্রথম পাল্লা খুললে সামনের চেম্বারে থাকত ছ'টা ডিম… জহুরি দণ্ডপথের দেওয়া ডিম, ভেতরে আছে আর একটা চেম্বার… সেখানে আমার ডানহাতের পুরো পাঞ্জা চেপে ধরতে হতো… এই সেকেণ্ড চেম্বারে বাকি তিনটে ডিম ছাড়াও থাকত বিস্তর অনিক্স পাথরের ডিম। প্রত্যেকটার ভেতরে চালানি হিরে… খনি থেকে চোরাই হিরে… হিরের খনি নিয়ে অনেক কথা তোকে আগে ভ্যাড়ভ্যাড় করে বলেছি। এ ব্যাপারটা মাথায় ঢোকানোর জন্যে…।

একটানা এতগুলো কথা বলে দম নেওয়ার জন্যে একটু যতি দিয়েছিল রবি রে! সুরুৎ করে সেই ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম আমার জেরা—ময়দানের শিল্পমেলা থেকে হাওয়া হওয়া পেশোয়ারি ডিম তুই নিয়েছিলি?

২১. রাঘব বোয়াল বিগ ব্রেন

২১. রাঘব বোয়াল বিগ ব্রেন

রবি রে চকমকি চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে আমার তরল চোখ আর শক্ত ঠোঁটের চেহারা-টেহারা একটু দেখে নিয়ে বললে, ইন্দ্র, তুই আগের জন্মে টিকটিকি ছিলি।

আমি বললাম, জুরাসিক যুগে ডাইনোসর ছিলাম। টিকটিকির পূর্বপুরুষ। মরুদ্যানের পেশোয়ারি পাথরের ডিম তোর খপ্পরে গেছিল?

হ্যাঁ, বন্ধু, হ্যাঁ। সাপ্লাই এসেছিল আমার নামে, মাল চলে এসেছে আমারই কাছে।

কে এনে দিল? তুই তো ময়দানের ত্রিসীমানায় যাননি?

সে খবরও রাখিস?

রাখতে হয়। কে এনে দিল?

রাঘব বোয়াল বিগ ব্রেন।

সেটা আবার কী বস্তু?

বস্তু নয়, একটা গুপ্ত সচ্ছা। এরা টেররিস্টদের আর্মস সাপ্লাই বিজনেস পণ্ড করে দেয় যে-কোনও প্রকার কৌশলে। পেশোয়ারি হিরে আমিই ভ্যানিশ করে দিয়েছিলাম এদেরকে দিয়ে—মূল্য ধরে দিয়েছি—সে হিরে এখন নিরাপদ—আমার জিম্মায়।

হিরে লেনদেন তোর বিজনেস। রাঘব বোয়াল বিগ ব্রেন নামক গুপ্ত সংস্থা নিয়ে তুই চোরাই হিরে কিনেছিস। কাজটা অন্যায়।

হ্যাঁ, বন্ধু, হ্যাঁ, বিজনেস ইজ বিজনেস।

সেই হিরে এখন কোথায়?

বেচে দিয়েছি ভাল লাভে। হিরে জমা হয় আমার পয়েন্টে… ডলার বেরিয়ে যায় পৃথিবীর অন্য পয়েন্টে… মাড়োয়ারি বিজনেসের মতো একটা চেন ওয়ার্ক। ইন্দ্র, এত কথা তোকে বললাম কেন, এবার তা বলছি। আমার অন্য হিরে যে নিখোঁজ হয়েছে।

অন্য হিরে? পেশোয়াড়ি পাথরের মধ্যের হিরে?

না। মন্ত্রপূত হিরে।

কল্পনা নিয়েছে? না'খানা ডিম?

না। ভেতরের চেম্বার খুলতে পারেনি। ভেতরে যে আর একটা চেম্বার আছে, সেটা খুলতে গেলে আমার পাঞ্জার ছাপ দরকার, তা জানত না।

বাইরের পাল্লা খোলার সিক্রেট জানত?

জানত।

তুই জানিয়েছিলিস?

হ্যাঁ।

কেন, মূখ কেন?

যেদিন সত্যি প্রেমে পড়বি, সেদিন বুঝতে পারবি।

মূর্খ, মিথ্যে প্রেমে মজা বেশি। সে কথা থাক। সিন্দুকের প্রথম পাল্লা তো খোলে তোর বুড়ো আঙুলের ছাপ চেপে বসলে। তুই দিতে গেলি কেন?

হিপনোটাইজড হয়ে।

হোয়াট?

তোকে বার বার বলে এলাম, কামরূপ কামাখ্যার মেয়ে যার মা, সে এাটক যোগসিদ্ধা... চোখে চোখে চেয়ে বনের পশুকেও বশ করতে পারে...

তোর মতো বুনোকেও...

বশ করেছিল। আমি ঘোরের মধ্যে চলে গেছিলাম। কী করেছিলাম, মনে নেই। ঘোর কাটলো সকালে ঘুম ভাঙবার পর। কল্পনা পাশেই ঘুমোচ্ছিল অঘোরে। খাট থেকে নেমে চটিতে পা গলাতে গিয়ে দেখলাম, একটা চটি নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, দেওয়াল সিন্দুকের সামনে রয়েছে। খটকা লেগেছিল। ঘুমন্ত কল্পনাকে না জাগিয়ে পা টিপে টিপে গিয়ে সিন্দুক খুলেছিলাম থাম্ব ইমপ্রেশন দিয়ে। জহুরি দণ্ডপথের দেওয়া পেশোয়ারি পাথরের বাক্স দুটো দেখতে পাইনি। এক-একটা বাক্সে থাকত তিনটে করে ডিম। পাঞ্জা ইমপ্রেশন দিয়ে ভেতরের চেম্বার খুলেছিলাম। সেখানে রয়েছে বাকি তিনটে ডিম... অন্য অন্য হিরে... পেশোয়ারি পাথরের কৌটোয়... বুঝলাম, রাতে, ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে কো আমার দিকে অমনভাবে চেয়েছিল কল্পনা... সবুজ পাথরের মতো চোখে যেন সবুজ শিখা দেখতে পাচ্ছিলাম... তারপর আর কিছু মনে নেই।

তারপর? তারপর?

অবান্তর কথায় কথা না বাড়িয়ে উপসংহারে চলে আসছি। যবনিকা টেনে দিলাম মারমার কাট-কাট কাণ্ডকারখানার পর। ডিভোর্স। এক পয়সাও অ্যালিমনি না নিয়ে যেন পরমানন্দে পলায়ন করল কল্পনা চিটনিস—দ্য গ্রেট চিটিংবাজ।

ছেলেকে ছেড়ে দিলি? তোর ঔরসের ছেলে—নিজের মুখে স্বীকার করেছিস। চাইলি না কেন?

চেয়েছিলাম। দেয়নি।

সেই ছেলেই কিডন্যাপড হয়ে গেল অনেক... অনেকদিন পরে... পাহাড়ি অঞ্চলে... যেখানে আমাকে ভালবেসে টেনে এনে রেখেছিল কল্পনা...

২২. কিডন্যাপার কে?

২২. কিডন্যাপার কে?

অবশ্যই বন্ধু হিসেবে।

মোহিনী মেয়ে কল্পনা আমার কাছে ঘ্যান ঘ্যান করেছিল ডিভোর্সি হয়ে যাওয়ার অনেক... অনেক পরে। রবি রে-র পেট থেকে একটু একটু করে সব কথাই তদ্দিনে আমার বের করা হয়ে গেছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হিরে নিয়ে ঝগড়া লাগতেই পারে। গয়নাগাটিতে আর শাড়ি-টাড়িতে মেয়েদের আকর্ষণ চিরকালের। সেকাল থেকে একাল-সব কালেই মেয়েরা এই রূপটা পাল্টাতে পারেনি। সুতরাং ওইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামানো দরকার মনে করিনি।

কল্পনার আহ্বান ফেলেও দিতে পারিনি। সব মেয়েরাই প্রয়োজনে দ্রৌপদী গোত্রের হয়ে যেতে পারে, এ রকম একটা বিকৃত ধারণা আমার মতো মেয়ে-বিরূপ পুরুষের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে। এটা এক ধরনের রোগ। মনের রোগ। আমার তো তাই মনে হয়।

কিন্তু কল্পনার ছেলেটা হাওয়া হয়ে যাওয়ার পর ছেলে চোর যখন টেলিফোনে শুধু ডিম চেয়ে বসল, তখন আমার টনক না নাড়িয়ে পারিনি।

রাঘব বোয়াল বিগ ব্রেন আসরে নামেনি তো? অথবা, রবি রে স্বয়ং?

বিগ কোয়েশ্চেন, তাই গা ঝাড়া দিয়েছিলাম। তখন কি জানতাম, আমাকেই কিডন্যাপার ঠাউরে খোদ রবি রে আসবে তেড়ে?

কবিতা বউদি, প্রিয় লেখক বন্ধু মৃগাঙ্কর প্রেম করে বিয়ে করা বউ, সুযোগ পেলেই আমাকে খোঁটা দিয়ে দিয়ে বলে, আমি নাকি একটা ভিজে বেড়াল... তক্কে তক্কে থাকি... চান্স পেলেই মহিলারূপিনী মৎস্য শিকার করি।

এসব খোঁচা আমি গায়ে মাখি না। আমি হলাম গিয়ে লক্ষ্যভেদী। অর্জুনের মতো। টার্গেট ছাড়া অন্যদিকে তাকাই না। সেই টার্গেটে উপনীত হতে গেলে যদি মহিলা-সহায়কের প্রয়োজন হয়, আমি দ্বিধা করি না। ওসব ঘেঁদো নীতির কমপ্লেকা আমার ভেতরে নেই।

কল্পনাকে অবলম্বন করেছিলাম সেই কারণেই। ফরাসি ছুটি নিয়ে ফেলেছিলাম। কর্তব্যের খাতিরে তাকে বন্ধুত্ব দিতে হিমালয়ে প্রস্থান করেছিলাম। নীড় রচনা করেছিলাম পৃথক আবাসনে। সে কথা আগেই বলেছি।

কল্পনা কি আমাকে ফাঁদে ফেলতে চায়নি? চেয়েছিল… চেয়েছিল… চেয়েছিল। কিন্তু আমি তো কখনও ওরসবুজ চোখের চাহনিতে নিষিক্ত হইনি—সে সুযোগ দিইনি।

অথচ ও কক্ষনো আগুনের সজীব ফুলকির মতো আমার সামনে আসেনি… আজকালকার শ্রীমতিদের মতো… বডি ল্যাংগুয়েজ আমাকে দেখাতে যায়নি… আজকালকার চটকদার চট্টালিকাদের মতো…

একদিনের কথা মনে আছে। সেদিন কল্পনা সবুজ শাড়ি পরে, দুই চোখের তারার েসবুজ প্রদীপ জ্বালিয়ে, দুই কর্ণাভরণে সবুজ পাথর দুলিয়ে, এমনকী নাকের পাটাতেও সবুজ পাথরের রোশনাই ছড়িয়ে… সবুজে সবুজ হয়ে… সবুজ বনলতার মতো আমার দেহকাণ্ডকে ঘিরে ধরতে চেয়েছিল…।

অথচ, সবুজ আগুন ছিল না কোথাও… না তনুমদিরায়, না বাক্যসুধায়… স্নিগ্ধতার এমন রূপ কখনও দেখিনি… আমাকে বলেছিল নিবিড় নৈকট্যের প্রলেপ মাখানো সহজ স্বরে—ইন্দ্রনাথদা, আমরা কি যুগলবন্দি হতে পারি না?

আমি নিপ্রদীপ স্বরে বলেছিলাম–বন্ধু স্ত্রী আমার বোনের মতো।

ও বলেছিল, এখন আমি মুক্ত…

বনচর…

কুরঙ্গী। ঈষৎ নতনয়না হয়ে অপাঙ্গে তাকিয়ে শুভ্র ভঙ্গিমায় জুড়ে দিয়েছিল কল্পনা—আমার তো কুরঙ্গ প্রয়োজন।

আমি বলেছিলাম, তাহলে ফিরে যাও আমার বন্ধুর কাছে।

তখনও ও আমার চোখের দিকে নিষ্পলক চাহনি মেলে রেখেছিল। আমি কিন্তু সেই সবুজ চুম্বকের দিকে ফিরেও তাকাইনি। রবির কাছে যে শুনে নিয়েছিলাম, কল্পনা ত্রাটক যোগসিদ্ধা। বনের পশুকেও বশ করতে পারে। কিন্তু আমি নিজেকে একটা অখাদ্য মনে করি। তাই চোখে চোখ রেখে নীতিহীন হতে চাইনি।

ছোট নিঃশ্বেস ফেলে কল্পনা বলেছিল, আমি নাকি দ্রৌপদী গোত্রের মেয়ে? তাই নাকি? আমার মুচকি জবাব। তবে কেন মহাভারতীয় পন্থায় এই শূন্য জীবনকে পূর্ণ করব না?

কারণ, মহাভারতীয় কাহিনির সমাজ এখন অতীতে চলে গেছে—জুরাসিক যুগের ডাইনোসরদের মতো এখন এই প্রথা অনুসরণ করা মানেই ডাইনি খেতাব অর্জন করা।

রেগে গিয়েও চোখের চাহনিতে তার আভাসটুকুও জাগতে দেয়নি কল্পনা। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, এই মেয়ে যদি সুচিত্রা সেনের সামনে ইণ্টারভিউ দিতে যেত, তাহলে বাংলার অভিনয় শিল্পের জগতে যে আকাল চলছে, তা আর থাকত না।

হযবরল বকছি? কাকেশ্বর কুচকুচে বলেই ধরে নিন আমাকে। কাককে কেউ পোষে না, মানুষ মাত্রই কাককে অবহেলার চোখে দেখে। অথচ চির অবহেলিত। এই কাক এই পৃথিবীতে নিজের জায়গা বজায় রেখে দিয়ে নিজের কাজটুকুই করে চলেছে। আমাকেও করতে দিন। আমার কাজ? পরোপকার। পকেটে কিছু আসুক আর না আসুক।

কল্পনার প্রেমের ভণ্ডামিতে তাই আমি ভুলিনি। আমি কাক, কাকের মতোই থেকেছি। তার অনিন্দ্য মুখশ্রী, তার কমনীর তনু, তার স্নিগ্ধ লাবণ্য, তার শিহরণ জাগানো আঁখিপাত, আমার শরীর থেকে উষ্ণ জ্যোতি বের করতে পারেনি। আমি একটা ফিলামেন্ট কাটা বিদ্যুত্বাতি। আমি একটা প্রতারক। যখন প্রেমের অল্প অভিনয় করি, রমণী যখন অপরাধের কুয়াশা রচনা করে, আমি তখন তা আমার এই যৎকিঞ্চিৎ অভিনয় শিল্প দিয়ে ছিন্নভিন্ন করি। তাই আমি অর্জুন হয়েও নই, বহু রমণীর পিপাসা মেটাতে ব্যগ্র নই।

কিন্তু আমি পাথর নই। আমার ভেতরেও সুর খেলা করে। আমার ভেতরেও কথা খেলা করে। তাই লিখছি। মনের কথা লিখে যাচ্ছি, তাতে তৃপ্তি পাচ্ছি। কথার এই ঝরণাধারা যদি আপনার মধ্যে অতৃপ্তি জাগায়, তাহলে হে পাঠক এবং হে পাঠিকা, অক্ষরের অরণ্য থেকে চক্ষু তুলে নিয়ে প্রবেশ করুন আমার মনের মধ্যে… দেখতে পাবেন—আমি কে, আমি কী, আমি কেন?

অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করবেন, আমি শ্রীহীন এই ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আদতে একটা বিকট বিশ্রী জিজ্ঞাসা চিহ্ন… এই রূপ নিয়ে আমি কারণ অন্বেষণ করি অপরাধের অন্ধকারে…

যেমন করছি এখন…

ছেলে চোর, সোমনাথকে যে অপহরণ করেছিল, সেই রাস্কেলটা, আমাকে টেলিফোন করেছিল, সে কথা এই কাহিনির প্রথম দিকে লিখেছি। ব্ল্যাক বিজনেস স্যুট পরে সবুজনয়না কল্পনা চিটনিস দুই তারকা রন্ধ্রে উৎকণ্ঠার মশাল জ্বালিয়ে আমার দিকে যে চেয়েছিল—সে কথাটা অবশ্য লিখিনি, আমি নিজেই যে তখন টেনশনের ধিকিধিকি আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছি মগজের মিলিয়ন বিলিয়ন কোষে কোষে। ছেলে চুরি তো আজকাল একটা লাভজনক ব্যবসা। রাজত্বে যখন রাশ থাকে না, মানুষের মজ্জাগত অপরাধগুলো কিলবিল করে ছড়িয়ে পড়ে বাজে। লেটেস্ট র্যানশম তো পঞ্চাশ লাখ টাকা। অপিচ এমন কাণ্ড-কাহিনি আমি শুনিনি। কিডন্যাপার বুক ফুলিয়ে চাইছে অর্ধকোটি মুদ্রা। এই মরুদ্যানে!

তাই আমি ভেবেছিলাম, কিডন্যাপার কোটি কয়েক মুদ্রা চেয়ে বসবে সোমনাথ-মূল্য বাবদ। হিরে বণিকদের পুত্রের দাম হিরে দিয়েই হয়। কোহিনুর-টোহিনুর টাইপের হিরেও চেয়ে বসতে পারত।

কিন্তু সে চাইল কী?

ডিম! চেয়েই, টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

অগত্যা আমাকে ফ্ল্যাশব্যাকের পর ফ্ল্যাশব্যাক দিয়ে আগের কাহিনী পিণ্ডদের টেনেমেনে আনতে হয়েছে সময়ের এই আক্রাগণ্ডার বাজারে। মিনি গল্পের যুগে

এই ম্যাক্সি ফ্ল্যাশব্যাক আদৌ প্রয়োজনীয় ছিল কি না, সমঝদার পাঠক (এবং পাঠিকা) নিশ্চয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছেন।

ডিম। যে ডিম নিয়ে তুফান রচনা করেছে কল্পনা সুন্দরী, যে ডিম পাচারে অংশ নিয়ে ছোটখাটো যক্ষরাজ হয়ে বসেছে দোস্ত রবি রে (যদিও তার দেহের গঠন কুৎসিত নয়, সে এক চক্ষু নয়, অষ্টপদের অধিকারীও নয়)—সেই ডিম চাইছে কিডন্যাপার–অতিশয় কর্কশ গলায়।

কিডন্যাপারদের কণ্ঠস্বর কর্কশই হয়—সায়গল-হেমন্ত-পঙ্কজের মতো হয় না। কিন্তু তার বাচনভঙ্গী আর বাক্য সংযমের তারিফ না করে পারিনি। সে চায় শুধু ডিম। টেলিফোন নামিয়ে রেখে মুক্তিপণের স্বরূপ শোনালাম কল্পনাকে। সে বিবর্ণ হয়ে গেল।

২৩. ডিম যখন মহার্ঘ হয়

২৩. ডিম যখন মহার্ঘ হয়

উৎসুক হয়েছেন কিছু পাঠক এবং অবশ্যই পাঠিকা। কেচ্ছা শুনতে চায় সবাই। এই কলকাতায় যদি একটা পি-এন-পি সি ক্লাব করা যায়, নির্ঘাৎ তার সেক্রেটারি হবেন এক ললিতা মহিলা।

পি-এন-পি-সি বস্তুটা কী? যাঁরা জানেন, তারা মুচকি হাসছেন, যাঁরা জানেন না, তাদের অবগতির জন্যে জানাই-পরনিন্দা পরচর্চা—সংক্ষেপে পি-এন-পি-সি।

যাকগে, যাকগে, মূলে ফিরে আসা যাক। শেকড় তাহলে এই ডিম। যত অনর্থ ঘটাচ্ছে এই ডিম। ডাইনো ডিমের মতোই লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়ে ছাড়ছে… অনিক্স পাথরেব ডিম।

আমি, টেলিফোন নামিয়ে রেখে, সবুজাভ নয়নার চোখে চোখ রেখে বললাম, কল্পনা, কেসটা ডিম চুরি নিয়ে।

কল্পনা আইভরি গ্রীবা বেঁকিয়ে বললে, কী বলতে চান?

আমি তার চোখের চাহনি এড়িয়ে গিয়ে নাকের পাথরটার দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি সব জানি।

কী জানেন?

জহুরি দণ্ডপথ বিশ্বাস করে যে ডিম দান করে গেছিলেন রবিকে, তুমি তা চক্ষুদান করতে গেলে কেন?

দপ করে জ্বলে উঠল কল্পনা রূপসীর রূপময় সবুজ চোখ–আমাকে যে দান করতে হয়েছে অনেক। প্রতিদান তখন পাইনি। পরে নিলাম।

হকচকিয়ে গেলাম ভেতরে। বাইরে রইলাম প্রশান্ত–তোমাকে দান করতে হয়েছে?

আজ্ঞে?

কাকে?

জহুরি দণ্ডপথকে।

অতি কষ্টে কণ্ঠস্বরকে নিষ্কম্প রেখে বললাম, কী দান?

অঙ্গসেবা।

অর্থ?

তখন, কল্পনা যে কাহিনি শুনিয়ে গেল, অতি সংক্ষেপে তা যযাতির লাম্পট্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

২৪. জহুরি যখন যযাতি হতে চায়

২৪. জহুরি যখন যযাতি হতে চায়

কল্পনা বলছে–

ইন্দ্রদা, দাদা বলেই এখনও সম্বোধন করব, বন্ধু রূপে তো রইলেন, অন্য রূপে নাই বা পেলাম…পেলে বর্তে যেতাম। তেরিয়া পুরুষদের আমার বড় পছন্দ-পুরুষ মানুষ ন্যাতাজোবড়া হলে কি মানায়? পুরুষ হবে কাটাগাছ অথবা কাটা গোলাপের মত… তুলতে গেলে আঙুলে ফুটবে… কিন্তু খোঁপায় মানায় ভাল।

ভুরু কুঁচকোবেন না। অপ্রিয় সত্যি বলছি তো, তাই মনে ধরছে না। তোয়াজ করা আমার ধাতে নেই।

অথচ একদা তোয়াজ করেই আমাকে থাকতে হয়েছে। কাকে জানেন? জহুরি দণ্ডপথ নামক ঋষিপ্রতিম বৃদ্ধটাকে। তাঁর চুল সাদা, ভুরু সাদা, দাড়ি সাদা। মুখের চামড়ায় কিন্তু যৌবন-কান্তি। কীভাবে এহেন যৌবনশ্রী ধরে রেখেছিলেন জানেন? একটু-আধটু আফিংয়ের জন্যে শুধু নয়। উনি যযাতি-প্রক্রিয়া আয়ত্ত করেছিলেন।

গোড়া থেকেই তাহলে শুনুন। জহুরি দণ্ডপথ অতি অমায়িক, অতি সজ্জন, অতি দয়ালু। এইটাই জানে জগজন। তিনি খুঁজে খুঁজে অনাথা রূপসীদের এনে হিরের কারখানায় কাজ করান, তাদের খাওয়া-পরা-থাকার ভার নেন। বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। দুর্নাম নাকি সুনামের আগে যায়, এমন একটা কথা আছে। কিন্তু তার বিপরীতটাও সত্যি বটে। সুনাম দুর্নামকে চাপা দিয়ে রাখে।

জহুরি দণ্ডপথ আসলে যে কি বস্তু, তা কেউ টের পায়নি। যারা টের পেয়েছে, তারা জীবন গেলেও মুখে প্রকাশ করতে পারেনি। যেমন আমি পারিনি। এখন পারছি

কেন? আমার পেটের ছেলে গায়েব হয়েছে বলে। ইন্দ্রদা, জহর কারখানার তরতাজা মেয়েরা পালা করে প্রতি রাতে যেত জহুরি দণ্ডপথের অঙ্গ সংবাহন করতে। যাকে বলে ম্যাসাজ-তাই সারা শরীর ডলে দিয়ে একই শয্যায় থাকতে হতো—এর বেশি আর যেতেন না বৃদ্ধ—অক্ষম ছিলেন বলে।

কিন্তু কেন এই মনোবিকলন? বৃদ্ধ বয়েসে কেন হেন ভ্রষ্টাচার?

তার একটা সুযুক্তি খাড়া করেছিলেন জহুরি দণ্ডপথ। বলতেন, দ্যাখো মেয়ে, পুরাণ ঘাঁটলে অনেক বিজ্ঞান জানা যায়। যযাতি লোকটা মুখ বজ্জাত ছিলেন না। তিনি জানতেন, যুবতীদের শরীর থেকে যে প্রাণজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, তা যুবকদের যেমন সক্ষম রাখে, তেমনি বৃদ্ধদের জরা এগোতে দেয় না। বিলেত আমেরিকায় নাকি এই টেকনিকেই ইয়ং বিউটিদের পার্সোন্যাল সেক্রেটারি বানিয়ে রাখা হয়। কল্প বিজ্ঞানের একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক তো ছ'জ বিউটিফুল যুবতীকে দিয়ে নিয়মিত বডি ম্যাসাজ করাতেন—তার জরা তাকে কাবু করতে পারেনি। পুরু আসলে নাকি হাজার বছর বাঁচেননি—ছেলের হাজার উপপত্নীদের পর নিয়েছিলেন যৌবন টনিক নিংড়ে নিয়ে নিজেকে তাজা রেখেছিলেন। হাজার শব্দটা গল্পে চলে এসেছে অন্যভাবে।

এইসব বুকনি সয়ে গিয়ে হাসি মুখে তার অঙ্গ সংবাহন করে যেতাম আমার পালা এলেই। নিশিযাপনও করতাম একই শয্যায়। কুমারী থাকতে পেরেছি কেন, তা আগেই বলেছি।

আমার পালা পড়ত বেশি। আমার এই হিলহিলে বিউটির জন্যে। আমাকে বলতেন, তুই একটা পাহাড়ি সাপ। জাপটে থাক। টের পাই শিরশির করে বিদ্যুৎ ঢুকছে ভেতরে।

কিন্তু বুড়ো বড় খলিফা। কখনও আমার চোখে চোখে তাকাতেন না। পাছে ঘোর সৃষ্টি করে পেট থেকে কথা বের করে নিই। তবে, আমার শরীরের বিদ্যুতেও বোধহয় সম্মোহন আছে। বোধহয় কেন, নিশ্চয় আছে। আপনি বড় হুঁশিয়ার, ইন্দ্রদা, তাই আমাকে টাচ করেন না। চান্স দেওয়া সত্ত্বেও।

জহুরি দণ্ডপথ আমার এই বডি-কারেন্টে এক-একদিন বেহুশ হয়ে যেতেন। প্রলাপ বকুনির মতো ছাড়া-ছাড়া কয়েকটা কথা বলতেন। যেমন, মন্ত্রগুপ্তি... মন্ত্রগুপ্তি...

নয় হিরে তো নয়, ওরা নবগ্রহ... অসাধ্য সাধন করতে পারে... ছয়। হিরে দিয়েও নয়ছয় করা যায়...

ঘোর কেটে গেলে, ভোর হয়ে গেলে, আমার চোখে চোখ রেখে বলতেন—কিছু বলেছি নাকি? শুনে যদি থাকিস, চেপে থাকিস। তোর সঙ্গে ভাল ছেলের বিয়ে দেব। এমন বাচ্ছা তোর পেটে আসবে যে অসম্ভবকে সম্ভব করবে।

এইভাবেই রাসলীলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন বুড়ো। দোষ কী। শ্রীকৃষ্ণ যদি ষোল হাজার গোপিনীর দৃষ্টান্ত রেখে যান, আমাদের মতো বিনা মাইনের মেয়েদেরকে দিয়ে বডি ম্যাসাজ তো করাবেনই—শুধু বিয়ের লোভ দেখিয়ে।

যাকগে, যাকগে, যথা সময়ে পেলাম আপনার বন্ধু রবিকে! সোজাসাপটা মানুষ। আঁচ করলাম, ওকেই মন্ত্রগুপ্তি দিয়ে গেছেন গুরু দন্ডপথ। যেহেতু আমি কিছুটা জেনে ফেলেছি, তাই আমাদের যুগলবন্দি করে রাখলে ঘরানা হয়ে গুপ্ত থেকে যাবে মন্ত্রগুপ্তি।

হিরে নিয়ে সেঁটে ঘেঁটে আমি নিজেও কিন্তু জেনে ফেলেছিলাম আর একটা ব্যাপার। হিরে শোধনের এক অক্ষরের মন্ত্র। একটা ওঁ-কারের ছ'টা পয়েন্টে ছ'টা হিরে বসিয়ে ওঁ জপ করে গেলে বিশ্বশক্তি চলে আসে হিরের মধ্যে দিয়ে শরীরের মধ্যে। হিরে শোধন হয় কিনা বলতে পারব না। তবে, শরীর-মন অন্যরকম হয়ে যায়। প্রাঞ্জল করতে হবে? এই দেখুন, এঁকে দেখাচ্ছি—
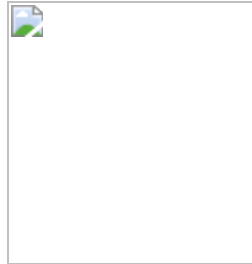
ছ'টা পয়েন্টে ছ'টা হিরে বসালে হিরের শক্তি আর ওঁ-কারের শক্তি এক হয়ে গিয়ে অন্য একটা শক্তি এনে দেয় ভেতরে। হিরে নিয়ে কাজ করার সময়ে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে এই কাণ্ড করতাম। তাই আপনার বন্ধুকে চট করে কজা করতে পেরেছিলাম। জহুরি দণ্ডপথও তো ঘোরের মধ্যে বলেছিলেন, ছয় হিরে দিয়ে নয়ছয় করা যায়।

তারপর কত চেষ্টা করলাম। ভবি ভোলবার নয়। তাই একদিন একটু চান্স পেয়েই ওরই বুড়ো আঙুল দিয়ে সিন্দুকের পাল্লা খুলিয়ে লোপাট করলাম ছ'খানা ডিম। বাকিগুলো হাতানোর আগেই ওর ঘোর কেটে আসছে দেখে আর এগোইনি। আর একবার চান্স নেব, ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু বড় হুঁশিয়ার মাল আপনার এই বন্ধুটি। আমাকেই না চার্জ করে বসল। সোজা বললে, হয় ডিম দাও, নয় ভাগো।

তাই ভেগেছি, ছেলেকে নিয়ে। আপনাকে পকেটে এনে ওকেও প্যাচে ফেলবার প্ল্যান যখন কষছি, ছেলে গেল চলে...

কে নিয়েছে তাকে? ডিম যার, নিশ্চয় সে। ছেলের বাপ।

আপনি তাকে ফিরিয়ে আনুন। আপনার বন্ধুকে খবর দিন। সে যা চায়, তাই পাবে, তাই পাবে—ফিরিয়ে দিক আমার ছেলেকে।

২৫. কিডন্যাপার যখন ইন্দ্রনাথ

২৫. কিডন্যাপার যখন ইন্দ্রনাথ

টেলিফোনে কিডন্যাপার চেয়েছে শুধু ডিম। ডিম রয়েছে দুজনের কাছে। একদা যারা স্বামী-স্ত্রী ছিল, তাদের কাছে। তার আগে তো তদন্ত দরকার। পুলিশকে ইনফর্ম করা দরকার। নইলে আমি যে ফেঁসে যাব। ফেঁসেও গেছিলাম। কীভাবে, সে প্রসঙ্গে আসছি পরে। তার আগে বলি।

রুটিন ইনভেসটিগেশনের কথা।

পুলিশ এল সেই রাতেই, আটটা বেজে কুড়ি মিনিটে।

কথার শুরুতেই কল্পনা বলে ফেলেছিল ভুটিয়া গুণ্ডা দোঙ্গা জংয়ের কথা। যে কি না খুনের ফিকিরে ছিল মা-ছেলে দু'জনকেই। যে টেনশন থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অছিলায় কল্পনা টেনে এনেছে আমাকে এই তুহিন অঞ্চলে। কিন্তু ঘটনাটার বিন্দু বিসর্গ জানিয়ে রাখেনি স্থানীয় আরক্ষা দফতরকে।

সেই পয়েন্টেই পুলিশ চলে এল প্রথমেই, কিডন্যাপিংয়ের হুমকি-টুমকি আগে এসেছিল কি?

আমতা আমতা করে কল্পনা আমার চোখে চোখ রেখেই সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, কিডন্যাপিংয়ের হুমকি না থাকলেও খুনের হুমকি ছিল।

কে দিয়েছিল? প্রশ্ন তো নয়, যেন পাথর বর্ষণ। কড়া গলা। শক্ত চোখ। এই দুইয়ের অধিকারিণী যে মহিলা অফিসার, তিনি চোর-ডাকাতের পিছন নিতে নিতে দুর্গেশনন্দিনী টাইপের মহিলা হয়ে গেছেন। পরনে টাইট জিনস শার্ট আর ট্রাউজার্স। চুল শক্ত বিনুনির দৌলতে টিকটিকি আকৃতি নিয়েছে। খরখরে দুই চোখে বিশ্ব-বিশ্বাস পুঞ্জ পুঞ্জ আকারে বিস্তৃত।

মিনমিন করে ভুটিয়া খুনে দোঙ্গা জংয়ের নাম করেছিল কল্পনা। ধমক খেয়েছিল তৎক্ষণাৎ। পুলিশকে তা জানানো হয়নি কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কেস যে লিকুইড হয়ে গেল, বোঝা হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

দোঙ্গা জংয়ের কেসটা যে কল্পনার কপোল-কল্পিত, এই সন্দেহ গোড়া থেকে দানা বেঁধেছিল আমার মনেও। কিছু মেয়ে চমৎকার মিথ্যে বলতে পারে। কল্পনার মোদ্দা মতলবটা ছিল তো আমাকে কাছে আনা। দোসরের দরকার সব কন্যারই।

আমি তা বুঝেও চুপ করেছিলাম। এসেছিলাম তো রবি রে-র আত্মকাহিনি শোনবার পর। পাঠক এবং পাঠিকা অশেষ ধৈর্যপূর্বক সেই কাহিনির সুদীর্ঘ পঠনের মধ্যে দিয়ে এতক্ষণ গেছেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদের মূলে পাথরের ডিম। হিরে ভরা ডিম। টেলেফোনেও এখন এল সেই ডিম্যাণ্ড—মুক্তিপণ কী? না, ডিম।

পুলিশ পুঙ্গবীর প্রশ্নের প্যাটার্ন প্রশংসনীয়। পুঙ্গবী' শব্দটা বাংলা অভিধানে কিন্তু নেই। আমি বানিয়েছিলাম। পুঙ্গব মানেই যদি হয় যাড়, ওইরকম মেয়েদের পুঙ্গবী বলে ডাকতে বাধা কোথায়? যে মহিলা অফিসারটি এসেছেন, তিনি তো মর্দা সেজেই এসেছেন। নারীত্বের লক্ষণ আবিষ্কার করে নিতে হয়।

যাক গে, যাক গে, বাজে বুকনি বেরিয়ে আসছে কলম দিয়ে। আমি তো ঝানু লেখক নই। পাঠক (এবং পাঠিকা) ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন।

খুনে গুণ্ডার দোহাই যে ধোপে টিকল না, তা মহিলা পুলিশের মুখ দেখেই বোঝা গেল। পোড় খাওয়া স্ত্রীলোক। শানানো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে ফট করে জিজ্ঞেস করলেন-আপনি?

একটুও রাঙা না হয়ে টুকটুকে ফর্সা কল্পনা বললে, মাই ফ্রেণ্ড।

অনিমেয়ে তাকিয়ে থেকে পুলিশ পুঙ্গবী বললেন, এই বাড়িতেই থাকেন?

বড় সাংঘাতিক প্রশ্ন। লাইনে চলে এসেছেন প্রশ্নকর্ত্রী।

জবাবটা দিলাম আমি—অন্য বাড়িতে থাকি। কাছেই।

অ। খুনের হুমকি যখন এসেছিল, তখন ছিলেন?

তারপরে এসেছিলাম। টু গিভ প্রোটেকশন টু আ লোনলি লেডি।

অ। আপনার প্রফেশন?

প্রাইভেট ডিটেকশন।

নাম?

ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

এইবার কিন্তু চোখের পাতা কাঁপিয়ে ফেললেন পুলিশ পুঙ্গবী। সেকেণ্ড কয়েক আমাকে দেখলেন। এই দেখাটা অন্য রকমের মনে হল। চোখের তারায় সেই আভাস লক্ষ্য করলাম। বললেন, আপনার তো ভারতজোড়া নাম। প্রাইভেট ডিটেকটিভরা কি এদেশে কি বিদেশে ডিভোর্সের কেস নিয়েই মেতে থাকে। আপনি তার ব্যতিক্রম। ঠিক বলছি?

হান্ড্রেড পারসেণ্ট।

খরখরে চাহনি লাবণী চাহনি হয়ে গেল। পুঙ্গবী বললেন, তাহলে আপনার মুখেই শোনা যাক। ছেলে নিখোঁজ হল কখন থেকে?

সব বললাম। গেমস ফ্রিকের আওয়াজ শুনে গিয়ে দেখলাম, যন্ত্র আছে, ছেলে নেই। শুধু বললাম না একটা কথা। মুক্তিপণ যে শুধু ডিম, সেই কথাটা। বললেই তো হাজারও কথার ঝাপি খুলতে হবে। তাই চেপে গেলাম। কল্পনাব নরুন চোখে দেখলাম নিপুণ কৃতজ্ঞতা।

মিসিং ডায়েরির পাট চুকোতে চুকোতে ঘড়িতে বাজল রাত সাড়ে আটটা। পাহাড়ি রাত সাড়ে আটটা কম নয়। খাদ-খন্দে নজর চালিয়ে মিসিং মানুষটার পায়ের ছাপ খুঁজতে গেলে নিজেদের জীবনের ছাপ মর্ত্য থেকে মুছে যেতে পারে। সে ঝুঁকির মধ্যে গেলেন না পুলিশ পুঙ্গবী, তবে আমার দিকে নজরপাতটা যে একটু অস্বাভাবিক রকমের হয়ে চলেছে, তা লক্ষ্য করে মনে মনে মজা পেলাম।

মজা মিলিয়ে গেল, যখন কল্পনার সামনেই তেড়া চোখে তাকিয়ে সোজা বললেন, কিছু মনে করবেন না, মিঃ রুদ্র। অন ডিউটি পুলিশকে অনেক অপ্রিয় কথা বলতে হয়।

আমিও চোখের পাতা না কঁপিয়ে পুলিশ পুঙ্গবীর চোখে চোখে চেয়ে বললাম, এবং সেই অপ্রিয় কথাটা কী, ম্যাডাম?

আগে মোটিভ, তারপরে ক্রিমিন্যাল অন্বেষণের গবেষণা, অ্যাম আই কারেক্ট?

হান্ড্রেড পারসেণ্ট। নাউ, হোয়াট ইজ ইওর অপ্রিয় কথা?

মোটিভ ওয়ান, র্যানশম আদায়। ভুটিয়া দোঙ্গা জং কালপ্রিট। যদিও সে ব্যাপারটা যথাসময়ে, রেকর্ড করানো হয়নি।

সুতরাং মোটিভ ওয়ান লিকুইড হয়ে গেল, এই তো?

ঝুলিয়ে রাখা হলো, হ্যাঙ্গিং। দোঙ্গা জংয়ের প্যাটার্ন অব ক্রাইম তো এরকম নয়। সেই লাইটনিং স্পীডে কাজ করে। আগেভাগে জানায় না। তাছাড়া, একবার। খুনের হুমকি, তারপর গায়েব-দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। শুধুমুও খুনের ভয় দেখাবে কেন? মুক্তিপণ চাইলেই তো পারত? না দিলে তখন

চুপ করে রইলাম। কল্পনা চিটনিসের এই কাল্পনিক মজুহাত আমিও বিশ্বাস করিনি। মিথ্যে কথা বলা একটা আর্ট। কোর্টে যারা মিথ্যে সাক্ষী দেয়, তারা এই আর্টে আর্টিস্ট।

পুলিশ পুঙ্গবী খরখরে চোখে আমার আর কল্পনার চোখের দিকে চেয়েছিলেন। চোখের আয়নায় মনের কথা গোপন থাকে না, ছায়া পড়বেই। কী ছায়া। তিনি দেখলেন, তা তিনিই জানেন, ফট করে বললেন, কিছু মনে করবেন না, মিস্টার… মিস্টার রুদ্র, আপনি মিসেস… মিসেস…

কল্পনা আস্তে বললে, আমার এক্স হাজব্যাণ্ডের পদবী রে। কিন্তু আমি তা ভুলে যেতে চাই।

ফাইন। ফরগেটফুলনেস ইজ ডিভাইন, অ্যাট টাইমস।

সার্টেনলি। টু ক্লোজ আ চ্যাপ্টার ফর এভার।

ফাইন, ফাইন ফাইন। তাহলে মিসেস চিটনিস…

বলুন, ম্যাডাম চিটনিস।

ওকে, ওকে, ম্যাডাম চিটনিস, মিস্টার ইন্দ্রনাথ রুদ্র এখন আপনার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড?

অফকোর্স।

মিস্টার রুদ্র, ডোন্ট মাইণ্ড, সেকেণ্ড সাসপেক্ট কিন্তু আপনি হয়ে যাচ্ছেন। তাই না? পথের কাঁটা ছেলেটাকে সরাতে পারলে…..

সহজ যুক্তি তাই বটে। বিশেষ করে আমিই যখন তাকে শেষ দেখেছিলাম।

অসহজ যুক্তি কিছু আছে নাকি? পুলিশ পুঙ্গবীর নয়ন তারকার তীক্ষ্ণতার প্রশংসা না করে পারলাম না। যেন একজোড়া নেপালি কুকরি।

ঠোঁটের কোণে কোণে আমার পেটেন্ট হাসি টেনে এনে বললাম, সেটা তো এত ঢাকঢোল পিটিয়ে করার দরকার ছিল না। পয়সা ছড়ালে ভাড়াটে কিডন্যাপারের অভাব হয় না। কল্পনা চিটনিস বাড়িতে থাকতে থাকতেই তা করানো যেত।

গুড আরগুমেন্ট।

লক্ষ্য করলাম, আমার মার্কামারা হাসিটার দিকে পলকহীন নয়নে তাকিয়ে আছেন পুলিশ পুঙ্গবী। নিগূঢ় এই হাসির অর্থ বিবিধ প্রকার হতে পারে। বন্ধুবর মৃগাঙ্ক রায়ের লেখনীতে তার ব্যাখ্যা মেলে। আমি বচনদক্ষ হতে পারি, কিন্তু কলমদক্ষ নই। তাই সামান্য হাসির একশো আট রকম ব্যাখ্যায় আর গেলাম না।

অবশেষে লক্ষ্য করলাম, পুলিশ পুঙ্গবীর পিঙ্গল চক্ষু তারকায় নৃত্যের আভাস।

কৌতুক নৃত্য!

বললেন, মিস্টার ইন্দ্রনাথ রুদ্র, আপনার সঙ্গে লড়বার ক্যাপাসিটি আমার নেই। কথার মারপ্যাচ বানাতে চাইছি না। সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখছিলাম। অপরাধ

যদি হয় মার্জনা করবেন।

অপরাধী তো আমি, বলে গেলাম, সুতরাং, এখন খবর দেওয়া হোক ছেলের বাবা রবি রে-কে। তাহলেই, পুলিশ পুঙ্গবীর চোখে চোখ রেখে বললাম, আর একটা বিষয় নিয়ে ভাবা যাবে।

আর একটা বিষয়। আস্তে আস্তে বললেন পুলিশ পুঙ্গবী, থিওরি নাম্বার থ্রী?

ইয়েস, ম্যঘাম। থিওরি নাম্বার ওয়ান, আমি কিডন্যাপার; থিওরি নাম্বার টু, রবি রে কিডন্যাপার; থিওরি নাম্বার থ্রী, ছেলেটা নিজেই নিজেকে কিডন্যাপ করেছে।

বুদ্ধিমতী পুলিশ পুঙ্গবী চকমকি চোখে বললেন, এমন ঘটনা আজকাল আকছার ঘটছে। ফিলিং অফ ইনসিকিউরিটি থেকে ছোটরা সে-কিডন্যাপিং কেস সাজাচ্ছে। ইয়েস, ইয়েস, এটা একটা সলিড সম্ভাবনা।

চার নম্বর থিওরিটা নিয়েও ভাবতে পারেন, আমার চোখ এবার পর্যায়ক্রমে ঘুরছে ঘরের দুই হিমালয় নন্দিনীর মুখের ওপর। একটুও যতি না দিয়ে কথা টেনে নিয়ে শেষ করে দিলাম চতুর্থ সম্ভাবনাটা, মা নিজেই ছেলেকে ভ্যানিশ করেছে লোক লাগিয়ে বাপকে ব্ল্যাকমেইল করবে বলে।

শ্বেতবদনা কল্পনা এখনই প্রকৃতই পাথরপ্রতিম। ধাক্কাটা একটু জোরালো হয়ে গেছে বুঝলাম। কিন্তু আমি নিরুপায়। তাই কথার জের টেনে নিয়ে বললাম পুলিশ পুঙ্গবীকে—এটা একটা ডিসেপশম ট্যাকটিক্স। আসল ব্যাপারটাকে গোপনে রাখার জন্যে অন্য ঘটনার বাতাবরণ সৃষ্টি করা। ম্যাডাম, দিস ইজ মাই অ্যানালিসিস। ভেবে দেখুন, খবর দিন, ছেলের বাবাকে।

ছেলের বাবা এসেছিল যথাসময়ে। এসেই যে সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিয়েছিল এক কথায়, তা পরের কথা হলেও এখন একটু ছুঁয়ে রাখি।

বলেছিল, হা হা, এটা ডিসেপশন ট্যাকটিক্সই বটে। পথের কাঁটা সরিয়েছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রমাণ? বন্ধুর ডিভোর্সি বউয়ের কাছে এসে রয়েছে কেন? ক্যারেক্টারলেস!

ইন্দ্রনাথ রুদ্রই তাহলে কিডন্যাপার!

২৬. কিডন্যাপারের পদসংকেত

২৬. কিডন্যাপারের পদসংকেত

আমি চলে এলাম আমার ডেরায়। কল্পনা চিটনিসের পাশের বাড়িতে। এক বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নিশ্চয় পূর্বাভাসের পথনির্দেশে। এখন বুঝলাম, সেই সিদ্ধান্ত কতটা নিরাপদে রেখেছে আমাকে। নইলে ফেঁসে যেতাম আগেই। আগুন আর ঘি পাশাপাশি রাখলে আগুন ঘি-কে গলাবেই। কল্পনার মতো শরীরী আগুন রেহাই দিত না আমাকে। ওর মতলব ছিল সেইটাই। কিন্তু আমার মতলব ছিল আরও গভীরে। সেই মতলব নিশ্চয় এতক্ষণে বিজ্ঞ পাঠক এবং সুচতুরা পাঠিকার অগোচরে থাকেনি।

ভিন্ন আবাসে থাকলেও বুদ্ধিমতী পুলিশ পুঙ্গবী কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। জানলা থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম, প্লেন ড্রেসে পুলিশ চর মোতায়েন করা হয়েছে বাড়ির সামনে। যাতে আমি চম্পট দিতে না পারি—রাতের আঁধারে।

শয্যাগ্রহণ করে, দু'হাতের দশ আঙুল পরস্পর সংলগ্ন করে মাথার তলায় দিয়ে, চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম রবি রে-তনয়ের কথা। ছেলেটা পয়লা নম্বরের বিচ্ছু নিঃসন্দেহে। বাপের উদ্দামতা আর মায়ের সর্পিল চিন্তাধারার রেশ নিশ্চয়। জিন-দৌলতে এসেছে তার মধ্যেও। আমার খুব ন্যাওটা হয়ে গেছিল ঠিকই। যখন তখন আমার ডেরায় এসে দুরন্তপনা করত। এটা-সেটা দেখতে চাইত। আমার ডেঞ্জারাস কীর্তিকলাপের কাহিনি শুনতে চাইত। কিন্তু, কী আশ্চর্য, বাপের প্রসঙ্গ ভুলেও তুলত না। শিশু মনোবিদরা এই সহজ সতর্কতার কি ব্যাখ্যা করবেন, তা জানি না। আমি কিন্তু আমার সহজ যুক্তি দিয়ে বুঝেছিলাম, পিতৃ প্রসঙ্গ সযত্নে। এড়িয়ে যাওয়ার পিছনে রয়েছে সযত্ন পিতৃ-স্মৃতি। স্মৃতির সেই মণিকোঠা কারুর কাছে উন্মোচন করতে চায় না। ওটা ওর ঠাকুর ঘর। কাউকে সেখানে ঢুকতে দিতে চায় না। সেখানকার কোনও কথা বাইরে আনতে চায় না। অথচ সব স্মৃতিই রয়েছে চেতন মনে অবচেতনে যায়নি। দশ বছর বয়স যে ছেলের, সে যদি মনের

জোরে মনের মধ্যে একটা প্রকোষ্ঠ সম্পূর্ণ নিজস্ব করে রাখে, তাহলে তা ভাবনার ব্যাপার বইকি। মনের রোগ এই থেকেই দেখা যায়। ফিলিংস অব ইনসিকিউরিটি। নিরাপত্তাহীনতা বোধ। সেল্ফকিডন্যাপিং কেস ইদানিং, আকছার ঘটতে দেখা যাচ্ছে এই কারণেই। এই ডিভোর্স-কণ্টকিত সমাজে।

সোমনাথ হয়তো সেই পথের পথিক।

আমার অতীত কার্যকলাপ জানবার আগ্রহ ওর মধ্যে দেখেছিলাম একটু বেশি মাত্রায়। একদিন আমার ট্রফির বাক্স খুলে ঘাঁটতে বসেছিল, আমাকে না জানিয়ে। কতজনের কত উপকার করেছি, কত জনে কত পুরস্কার প্রদান করেছে, সে সব। ঠেসে রেখে দিতাম একটা চেন-টানা ব্যাগে। সেই ব্যাগে ছিল একটা পঞ্চকোণ রূপোর তারকা। বেশ ভারি। প্রতিটি কোণ ছুঁচের মতো সরু। ওপরে লেখা আমার নাম।

হাতের চেটোর মতো বড় মেডেলটা নিয়ে ও যখন উল্টেপাল্টে দেখছে, আমি দেখে ফেলেছিলাম আমার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র রাখা ব্যাগ নিয়ে ওর কৌতূহল। আমার মোটেই ভাল লাগেনি। ব্যাগটা হাত থেকে নিয়ে, চেন টেনে দিয়ে, মাচায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

রূপোর তারকাটা সসামনাথকে প্রেজেন্ট করেছিলাম। বলেছিলাম, হিরো হওয়ার এই প্রাইজ দিলাম তোকে। হিরো হবি জীবনে, এই আমার আশীর্বাদ।

গোয়েন্দাগিরি বড় বেপরোয়া পেশা। এ পেশা গ্রহণ করব, এমন সাধ বা শখ। কলেজ জীবনে আমার ছিল না। ছিল আমার আর মৃগাঙ্ক রায়ের প্রাণের বন্ধু। প্রেমচাঁদ মালহোত্রার। পাঞ্জাব তনয়, ধর্মে শিখ। একে নম্বরের ডানপিটে আর হুল্লোড়বাজ। স্কটিশ চার্চ কলেজে আমাদের এই ত্রয়ীকে সমীহ করে চলত ললনারা। কারণ আমাদেব বাক্যবাণ ছিল বড় তীক্ষ্ণ। চোখাচোখা। বিশেষ করে প্রেমচাঁদের। যেহেতু ওর নামের আগে প্রেম আছে, সুতরাং হৃদয়ে প্রেম থই থই করছে, এই জাতীয় রসাল মন্তব্য টুকুস টুকুস কার সহপাঠিনীরা ছুঁড়ে দিলেই ও টকাস টকাস জবাব দিয়ে যেত। কিছু কিছু টিপ্পনি আজও মনে আছে। যেমন, হে প্রিয়ংবদা, তোমার ওই সূক্ষ্ম চাহনির ছুঁচ আমার এই মোটা চামড়ায় লাগলে ভোতা হয়ে যাবে। অথ, সখী, হঠাৎ ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছ কেন আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে? তোমার ওই লিপস্টিক কমিউনিকেশন ব্যর্থ যাবে এই চঁড়ালের কাছে। ঠোঁট যে সবচেয়ে স্পর্শকাতর অঙ্গবিশেষ বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া সাধনের

জন্যে, তা কি আমার অজানা নয়? অথবা, সিলিকন বুক নাকি? অত দেখান হচ্ছে কেন?

লজ্জায় লাল হয়ে আমোদিনী কন্যাটি তখন পালাবার পথ পেত না, আর এক দুঃসাহসিনী মিঠে মিঠে হেসে বলে যেত—বুঝেছি, ওটা পদাঘাতের সংকেতে নয়, একেই বলে ম্যাকো পোজ ফর দ্য রাইট ম্যান। বাট, মাই ডিয়ার ইয়ং লেডি, আই অ্যাম দ্য রং ম্যান।

বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সপার্ট প্রেমচাঁদ এরকম কত কাণ্ডই করেছে কলেজ লাইফে। ওর চোখে কোনও সংকেত এড়িয়ে যায়নি। কোন কন্যার চোখে দ্যুতি ফুটিয়েছে অথবা পা ঠুকে চলেছে। অথবা ডান পাকে বিশেষ কোণে প্রেমাদের দিকে ফিরিয়ে রেখেছে অথবা বুকের ওপর দু'হাত বিশেষ কায়দায় ভাঁজ করে নিরুপম বক্ষপিণ্ডকে উঁচিয়ে রেখে, এসব ভ্যালেনটাইন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সংকেত মাঠে মারা যেত কাঠখোট্টা প্রেমর্চাদের কাছে।

প্রেমচাঁদ প্রসঙ্গ নিয়ে আচমকা এত কথা লিখলাম কেন? কল্পনার কাণ্ড দেখে সব যে মনে পড়ে গেল। হরেক বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমার ওপর প্রয়োগ করে গেছে কল্পনা। কিন্তু এই ঘি তাতে গলেনি। প্রেমাদের কথা আরও বেশি করে মাথায় খেলে যাচ্ছিল সোমনাথ হাওয়া হয়ে যাওয়ার পর থেকেই।

আমি ডিটেকটিভ হব, কস্মিনকালেও ভাবিনি। আমার সেই যোগ্যতাই নাকি নেই। মুখ ফেঁড় প্রেমচাঁদ তো সোজাসুজি আমাকে বলত, ভেড়ুয়া বাঙালি। আমিও তেড়ে উঠে বলতাম, তেড়িয়া শিখ, শুধু কৃপাণ চালিয়েই যাবি সারাজীবন।

কিন্তু ভাগ্যচক্রে আমি যখন শখের গোয়েন্দা হলাম, রিস্ক কম বলে, স্রেফ হবি তো —প্রেমচাঁদ তখন সিরিয়াস হয়ে গোয়েন্দাগিরিকে পেশা করে নিয়ে একটু একটু করে জাল ছড়িয়ে দিয়ে ঘাঁটি পেতে বসল গোটা পৃথিবী গ্রহটায়। শিখ জাতটা একটা জাত বটে। আজকে ওর গোয়েন্দা সংস্থা টেক্কা দেয় আমেরিকার এফবিআই-কে, ওর কীর্তিকলাপের খবর রাখে ইণ্ডিয়ার 'র' অর্থাৎ রিসার্চ অ্যাণ্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং। এই সাইবার আর হাইটেক ক্রাইমের যুগে পেছিয়ে নেই শিখ নন্দনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।

সেই নির্ভীক শিখ বন্ধুর শরণ নেওয়া মনস্থ করলাম চিৎ হয়ে শুয়ে কড়িকাঠ নিরীক্ষণ করতে করতে।

ঝিমুনি এসেছিল কিছুক্ষণের জন্যে। সমস্ত সত্তা যখন সজাগ থাকে, তখন মগজে তন্দ্রা প্রলেপ লাগিয়ে যায়, মগজ কিন্তু ঘুমোয় না। মানুষের মগজ জন্ম মুহূর্ত থেকে ঘুমোয় না। মগজ অতন্দ্র। মগজ আজও অজানা রহস্য।

তাই ভোর রাতে উঠে পড়েছিলাম আমার বডি অ্যালার্মের সংকেতে। এবার বেরোতে হবে। নিখোঁজ সোমনাথকে খুঁজতে যেতে হবে।

ঠিক সেই সময়ে বেজে উঠেছিল আমার স্যাটেলাইট টেলিফোন। পুলিশ পুঙ্গবীব কাঠ-কাঠ ধারালো কথাগুলো কানের পর্দায় বিঁধে বিঁধে গেছিল—মিস্টার ইন্দ্রনাথ রুদ্র?

স্পিকিং।

কিডন্যাপারের টেলিফোন কল ব্যাক আপ করা হয়েছে। চোরাই মোবাইল থেকে ফোন করা হয়েছিল।

আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম। সব কিডন্যাপার তাই করছে।

ইয়েস, ম্যাডাম।

পাহাড়ের ঢালে তখন বোদ এসে পড়েছে।

পুলিশ পুঙ্গবী বললেন, গেমস ফ্রিক কোথায় পড়েছিল, মিঃ রুদ্র? ঢাল বেয়ে নেমে গেলাম একটু একটু করে। মাটি এখানে আলগা। কাল বিকেলেই এক দফা হেঁটেছি, মাটি তোলপাড় করেছি পায়ের জুতো দিয়ে। হেঁটে গেলাম পাশ কাটিয়ে। সরু পথটা বাঁচিয়ে হাঁটছি। সোমনাথ ওই পথ দিয়েই নেমেছে। ওর পায়ের ছাপ যেন নষ্ট না হয়ে যায়। ওর ফুট প্রিন্ট স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—গতকাল যে রকম দেখেছিলাম, সেইভাবেই রয়েছে।

পৌঁছে গেলাম গাছপালার জায়গায়। এখান থেকেই জমি পাথুরে হতে হতে চলেছে। মাটির ভাগ কম। তাতে ঘাবড়ালাম না। পায়ের ছাপ পড়ুক, গতকাল তো

দেখে গেছি, কোথায় পড়েছিল গেমস ফ্রিক খেলনা। ঢাল বেয়ে শর্টকাট করলাম। পুলিশ পুঙ্গবী দুবার হড়কে গেলেন।

পৌঁছে গেলাম ঘেসো জমিটায়, যেখানে গতকাল পড়ে থাকতে দেখেছি গেমস ফ্রিক টয়। সোমনাথের পদচিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এদিকে-সেদিকে।

হেঁট হলেন পুলিশ পুঙ্গবী। নরুন চোখে দেখে গেলেন প্রতিটি ফুট প্রিন্ট। মুখ তুললেন, এই ছাপগুলো আপনার জুতোর?

হ্যাঁ। এখন যা পায়ে রয়েছে।

পা তুলে, জুতোর তলদেশ ধরলাম ভদ্রমহিলার চোখের সামনে। কোনও মহিলাকে এভাবে জুতো দেখানো অতিশয় অভদ্রতা। কিন্তু পুলিশি তদন্তে এ সব। তুচ্ছ ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে নেই। পুলিশ পুঙ্গবীও দিলেন না। চারু নয়নে সুচারুভাবে আমার পাদুকার তলদেশ নিরীক্ষণ করলেন। যেন, আয়নায় মুখ দেখাছেন। যৎকিঞ্চিৎ পরিহাসের প্রয়াস সামলে নিলাম। কারণ, এই মুহূর্তে তিনি কাঠার নয়না। এবং স্থিতধী। সূচিপৃক্ষ চাহনি নিবদ্ধ সোমনাথের বিশেষ প্যাটার্নের শু-প্রিন্টের ওপর। কয়েক জায়গায় ঘাড়ে ঘাড়ে পড়েছে জুতোর ছাপ। খেলনা। নিয়ে মেতে ছিল নিশ্চয় ঘেসো জমিতে। তারপর নেমে গেছে ঢাল বেয়ে। আমি। ফলো করলাম সেই ফুট প্রিন্ট-সাধারণ চোখে যা অদৃশ্য।

অদৃশ্য পুলিশ পুঙ্গবীর চোখেও। তাই বললেন, চললেন কোথায়?

পায়ের ছাপের পিছনে।

আপনি কি ব্লাডহাউণ্ড?

গত জন্মে ছিলাম।

ঘাসের মধ্যে বিলীয়মান সোমনাথ-পদচিহ্ন ফুট আষ্টেক এসেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। এইখান থেকে যেন ডানা মেলে উড়ে গেছে ছেলেটা।

তীক্ষ্ণ নয়া পুলিশ পুঙ্গবী তা লক্ষ্য করলেন। বললেন, কেউ যদি তুলেই নিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তো তার পায়ের ছাপ থাকবে। অথবা ধস্তাধস্তির চিহ্ন। কিছুই তো দেখছি না। কারণ তারে আচমকা তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তাই যদি হয়, পুলিশ পুঙ্গবীর ভুরুযুগল গাণ্ডীব ধনুর মতো বক্র—তাহলে যে তুলে নিয়ে গেছে, তার পায়ের ছাপ তো থাকবে।

আমি জবাব দিলাম না। দিতে পারলাম না। ডানা মেলে উড়ে যায় না একটা মানুষ। হনুমানের মতো লাফ দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে যায় না। সোমনাথের পায়ের ছাপ কিন্তু আচমকা আর নেই। জমির দিকে নজর রেখে তিন-চার গজ দূরে এসে থমকে দাঁড়ালাম।

মাটিতে জাগ্রত রয়েছে অস্পষ্ট পাদুকাচিহ্ন।

এই জুতোর গোড়ালি বড়। সোমনাথের জুতোর গোড়ালির চাইতে বড়।

হেঁট হলাম গোড়ালির পিছনে। জুতোর ডগা যেদিকে ফিরে থাকা উচিত, তাকালাম সেদিকে। ডগা ফিরে রয়েছে সোমনাথের শেষ পদচিহ্ন যেখানে রয়েছে, সেইদিকে।

সোমনাথ-পদচিহ্নকে কেন্দ্রবিন্দু করে একটা চক্কর মারলাম—বড় গোড়ালিওলা জুতোকে দিয়ে মনে মনে একটা বৃত্ত ভেবে নিয়ে।

কিন্তু নেই। নেই আর কোনও ফুটপ্রিন্ট। অথচ থাকা উচিত ছিল। বড় গোড়ালির ছাপ পড়েছে আধখানা। তারপর আর কিছু নেই। পুরো জুতোর ছাপ তো নেই-ই গোড়ালির ছাপটাও পুরো পড়েনি। কিন্তু পয়েন্টিং করে রয়েছে সোমনাথের জুতোর ছাপের দিকে।

মনে মনে কল্পনা করে নিলাম ঘটনা-দৃশ্য। কল্পনা দিয়ে বানিয়ে নিলাম কী কী ঘটেছিল, কেমনভাবে ঘটেছিল। এমন ঠাণ্ডাতেও মনে হল, বুঝি ঘামছি।

এদিকের এই পাহাড়ি ঢলে শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে রাশি রাশি। ঢাল বেয়ে পা টিপে টিপে জান্তব চরণে উঠে এসেছে একটা লোক। ঝোপের আড়ালে আড়ালে উঠেছে, শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে উঠেছে, অথচ বনচর শিকারি পশুর মতো পায়ের শব্দ জাগ্রত করেনি এতটুকু। তাই কিছু শুনতে পায়নি সোমনাথ। শুকনো পাতা আর ভাঙা ডাল মাড়িয়ে এইভাবে নিঃশব্দ চরণে আসতে পারে শুধু বনের মাংসাশী শিকারি বেড়াল জাতীয় প্রাণি। ঝোপ ভেদ করে সেই মানুষ-বনচর সোমনাথকে দেখতে পায়নি—কিন্তু তার গেমস ফ্রিকের আওয়াজ শুধু কানে শুনে উঠে এসেছে ঢাল বেয়ে একটু একটু করে। তারপর প্যান্থার লম্ফ মেরে দশ

বছরের ছেলেটাকে তুলে নিয়ে গেছে এমনই বিদ্যুৎসম ক্ষিপ্রতায় যা চোখে না দেখলে প্রত্যয় হবে না। চেঁচানোর সুযোগটুকুও দেয়নি সোমনাথকে। এইভাবে যারা মানুষ গায়েব করে, তারা জানে, আগে খপ করে কীভাবে মুখ বন্ধ করতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে শূন্যপথে বড়ি তুলে নিয়ে যেতে হয়।

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম চারদিকে। দশ ফুট দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না।

সোমনাথও দেখতে পায়নি দশ ফুট দূরের ঝোপের মধ্যে গা ঢেকে ওত পেতে থাকা আততায়ীকে।

গলা শুকিয়ে এসেছিল আমার কিডন্যাপিং সিনটা কল্পনা করতে গিয়ে! পুলিশ পুঙ্গবী একদৃষ্টে চেয়েছিলেন আমার ভাবনা-ক্লিষ্ট চোখের দিকে।

এখন বললেন খুব আস্তে, আপনি ধোঁকায় পড়েছেন? চোখে ধোঁয়া দেখছেন?

হয়তো কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গের প্রলেপ ছিল। কিন্তু আমি তা গায়ে মাখিনি। শুকনো গলায় বলেছিলাম, ম্যাডাম, এ কাজ যে করেছে, তার কমব্যাট এক্সিপিরিয়েন্স আছে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে ওস্তাদ?

ইয়েস, ম্যাডাম। শিকারি জন্তুর মতো পেছন নিতে পারে, ছোঁ মেরে শিকারকে তুলে নিয়ে যেতে পারে, দশ ফুট লাফিয়ে আসে উড়ন্ত পাখির মতো, চেঁচানোর সুযোগ দেয় না, টুটি টিপে ধরে, মুখ বন্ধ করে দিয়ে।

যেন গা হিম হয়ে গেল ম্যাডাম পুলিশের, অন্তত মুখ দেখে তাই মনে হয়েছিল আমার। অথচ পাহাড়ের মেয়ে তিনি, বিলক্ষণ ডাকাবুকো।

কিন্তু মানুষ-শিকারি নন। সোমনাথকে যে নিয়ে গেছে, সে পোক্ত ম্যান-হান্টার। এই পাহাড়ে সে ঘাপটি মেরে নজর রেখেছে আমাকে আর সোমনাথকে বেশ কয়েকদিন ধরে। মুখস্থ করেছে দু’জনের সমস্ত গতিবিধি। কোথায় হাঁটি, কোথায় দাঁড়াই-সমস্ত। সে জানত আমি কোথায় থাকি, সোমনাথ কোথায় থাকে, আর তার মা এখন কাছে নেই। নজরে নজরে রেখেছিল বলেই জেনেছিল কখন একা-একা বেরিয়ে গেল সোমনাথ। ছোঁ মেরেছে ঠিক তখনই।

এ হেন লোকেদের অসাধ্য কিছু নেই। এর জন্যে দরকার স্পেশ্যাল ট্রেনিং। যে ট্রেনিং আছে আমারও।

২৭. হোকাস পোকাস নয় এই কিডন্যাপিং

২৭. হোকাস পোকাস নয় এই কিডন্যাপিং

বাড়ি ফিরেই ফোন করলাম প্রেমচাঁদকে—কমব্যাট এক্সপিরিয়েন্স খার আছে, এমন একজনকে পাঠা। কুইক। সোমনাথ কিডন্যাপড়। সন্দেহভাজন আমি।

সেকেণ্ড কয়েক কোনও জবাব দিল না দুর্ধর্ষ বন্ধু। বললে তারপর, সুফি যাচ্ছে।

সুফি মানে একটা টেরর। শরীরী আতঙ্ক। আমি তার নাম দিযেছি, অ্যালোপেসিয়া হাল্পে। কারণ, সে নির্লোম মানুষ।

তার হাত পা আর আগ্নেয়াস্ত্র চলে সমান তালে, প্রায় লাইটনিং স্পীডে। যখন প্রতিপক্ষ থ' হয়ে যায় তার লোমহীন অবয়ব দেখে।

এমন মানুষকেই আমার এখন দরকার। প্রতিপক্ষকে সমঝানো দরকার, ঘাঁটিয়েছ কাকে। তার নাম ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

কল্পনার মুখ থেকে বুঝি সব রক্ত নেমে গেল পায়ের দিকে, আমার কথা শেষ হওয়ার পর। একটি কথাও না বলে রিসিভার তুলে কনট্যাক্ট করেছিল রবি রে-কে —এখুনি এস। সোমনাথ কিডন্যাপড হয়েছে।

এবার শোনা যাক সোমনাথের কাহিনি—তার জবানিতে?

ইন্দ্রনাথকাকুর বাড়ির নিচে গেমস ফ্রিক নিয়ে তন্ময় হয়েছিলাম। বেশ নিরিবিলি জায়গা। চারদিকে মানুষ-টানুষ নেই। যেদিকে তাকাই শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ। এমন জায়গায় এসে আমার অনেক কথা

মনে পড়ে যায়। খুব ছেলেবেলার কথা। আমাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করত বাবা আর মা। চোখের মণি ছিলাম দু’জনেরই। এখন একজনের। কী যে হল। মা বলে, বাবাকে আর মনে রাখবার দরকার নেই। মনে কর, তোর বাবার জায়গায় এসেছে ইন্দ্রনাথ কাকু। দেখছিস তো তোকে কত ভালবাসে। কত কিছু কিনে দেয়। তোর আগের বাবা তোর খোঁজও নেয় না।

‘আগের বাবা’ কথাটা আমার কানের মধ্যে খচ খচ করে লাগে। আগের বাবা’ আবার কী? বাবা তো একজনই হয়। বাবার জন্যেই তো আমি জন্মেছি। আমি কি বাচ্ছা ছেলে? কিছু বুঝি না? বাবা কখনও পাল্টায়? মা ওই সব ধানাইপানাই বলে আমার মনটাকে কাকুর দিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়। আমি যেন কাকুকে বাবার মতো দেখতে শিখি। ভালবাসি। আপন করে নিই। তাহলে মায়ের সুবিধে হবে। কী সুবিধে হবে, তা কি আমি জানি না? আমি অত বোকা নই। মা তো বাবাকে ডিভোর্স করেছে। নাকি, বাবা ডিভোর্স করেছে মাকে পরিষ্কার জানি না। তবে, খুব চেঁচামেচি হয়ে গেছিল দু’জনের মধ্যে। হিরে নিয়ে নিশ্চয়। হিরে… হিরে শব্দটা আড়াল থেকে কানে এসেছিল। মা নাকি বাবার হিরে নিয়েছে। কী আশ্চর্য! বাবা তো মাকে অনেক গয়না দিয়েছে। হিরেও নিশ্চয় দিয়েছে। তাতে এত মাথা গরম করবার কী আছে? দোযটা বাবার।

কিন্তু মা যখন গয়নার বাক্স খুলে নাড়াচাড়া করে, হিরে তো আমি দেখিনি। একদিন জিজ্ঞেস কবেছিলাম—মা, হিরেগুলো কোথায়? মা আমাকে ঠাস করে চড় মেরে ছিল। তারপরেই আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিল। কী কান্না! কী কান্না!

সেই থেকে হিরে নিয়ে আর কোনও কথা আমি বলি না। আমার যখন ছ’বছর। বয়স, তখন এইসব ব্যাপার ঘটেছিল। তারপর মা চলে এল এই পাহাড়ে। বাবাকে আর দেখিনি। কষ্ট হয়। কিন্তু মুখে বলি না।

এমন সময়ে এলেন ইন্দ্রনাথকাকু। মস্ত গোয়েন্দা। হিরে খুজতে নাকি? আমার সন্দেহ হয়। নাকি, আমার মাকে বিয়ে করতে? মায়ের রকমসকম দেখে বুঝতে পারি, মা চায় তাই। ইন্দ্রনাথকাকুকে বিয়ে করতে।

আচ্ছা, হিরেগুলো ইন্দ্রনাথকাকুর কাছে নেই তো? গোয়েন্দা তো। হয়তো হারিয়ে যাওয়া হিরে উদ্ধার করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। সেই লোভ দেখিয়ে মাকে বিয়ে করতে চাইছেন। গোয়েন্দারা সব পারে।

কিন্তু আমি তো তক্কে তক্কে থাকি। ইন্দ্রনাথ কাকু আমাদের বাড়িতে থাকেন না কেন? হিরে যাতে মায়ের হাতে না পড়ে, নিশ্চয় সেইজন্যে। এই দশ বছর বয়েসে আমি কচি খোকা নই। নজরে নজরে রাখি ওঁকে আর মাকে। একবারও মায়ের গা ছেন না ইন্দ্রনাথকাকু। সব সময়ে তফাতে থাকেন। রাত হলে অন্য বাড়িতে। এ বাড়িতে শুধু আমি আর মা। অনেক আগে আমরা তো তিনজনে এক সঙ্গেই থাকতাম। আমি, বাবা আর মা।

গোয়েন্দার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে চেয়েছিলাম একদিন। ইন্দ্রনাথকাকুর জিনিসপত্র হাঁটকে দেখছিলাম যদি হিরে-টিরে পাওয়া যায়। কিন্তু ধরা পড়ে গেছিলাম। বকেননি। উল্টে আমাকে একটা সিলভার স্টার প্রেজেন্ট করেছিলেন। পঞ্চকোণ রজত নক্ষত্র। বেশ ভারি। বলেছিলেন, বীরত্ব দেখিয়ে পুরস্কার পেয়েছিলাম। তোকে দিলাম। বীরপুরুষ হবি—এই স্টারের জোরে।

পকেটে রাখি সেই স্টার। কোণগুলো বড় ধারালো। গায়ে ফুটে যায়। কিন্তু নিজেকে মস্ত গোয়েন্দা মনে হয়। মহাবীর। শক্তিমান। টিভির শক্তিমানের মতো যা খুশি করতে পারি।

গেমস ফ্রিক চালিয়ে রেখে এইসব যখন ভাবছি, আচমকা কে যেন আমার মুখ চেপে ধরল পিছন থেকে। চোখেও হাত চাপা দিল। ঝটকান মেরে তুলে নিল শূন্যে। সাঁ সাঁ করে এত তাড়াতাড়ি বয়ে নিয়ে গেল আমাকে যেন আমি একটা সোলার পুতুল। এমনভাবে খামচে ধরেছিল, একটুও নড়তে পারিনি, চেঁচাতে পারিনি। আমি টিভির শক্তিমান, কিন্তু আমাকে যেন পোকা বানিয়ে ফেলেছিল। প্রথমটা হকচকিয়ে গেছিলাম। তারপর স্পষ্ট মনে হল, নিশ্চয় ইন্দ্রনাথকাকু কিছু একটা মতলব এঁটেছেন আমাকে নিয়ে।

শুন্যপথে আমাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে, একটুও আওয়াজ করতে না দিয়ে, ঢাল বেয়ে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল একটা গাড়ির মধ্যে। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেছিল দরজা। আওয়াজ শুনে বুঝেছিলাম, বেশ ভারি দরজা। গাড়িটাও নিশ্চয় তাই। আঠালো ফিতে দেওয়া হয়েছিল আমার মুখের ওপর। তারপর একটা থলি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাথা গলিয়ে—যাতে কিছু দেখতে না পাই। ফিতে সেঁটে দেওয়া হয়েছিল হাত আর পায়েও। কিন্তু লড়ে গেছিলাম। ফিতে যাতে লাগাতে না পারে, তাই হাত-পা ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু চোখে না দেখলেও বুঝেছিলাম, একজন নয়, অনেকজন আমাকে কাবু করে রেখেছে। আরও বুঝেছিলাম, রয়েছি একটা ভ্যান গাড়ির মধ্যে। ডিজেল তেলের গন্ধ পাচ্ছিলাম।

তারপরেই গাড়ি চলতে শুরু করেছিল। ড্রাইভিং আরম্ভ হয়ে গেছিল। যে লোকটা আমাকে খামচে-খুমচে ধরে রেখেছিল, সে বললে, কেউ দেখে ফ্যালেনি তো?

ড্রাইভার যেখানে বসে, জবাবটা এসেছিল সেইদিক থেকে-না।

এই লোকটাই তাহলে আমাকে কাঁক করে ধরে তুলে এনেছে।

যে লোকটা আমাকে পিষে মারছিল, সে বললে, ও ছেলে, নিশ্বাস নিতে পারছ তো? ঘাড় কাত করে হ্যাঁ বল।

আমি তখন ভয়ে কাঠ। কিছু করিনি।

ড্রাইভ যে করছিল, সে বললে, বুকে হাত দিয়ে দেখলেই তো হয়—হার্ট চালু থাকলেই বেঁচে আছে। এক পাটি জুতো ফেলে এলে পারতাম।

যে আমাকে ধরে রেখেছিল, সে বললে, খেলনাটা তো ফেলে এসেছ, ওতেই হবে। জুতোর চেয়ে বড় প্রমাণ।

গাড়ি নেমে গেল নিচের দিকে। আবার উঠল ওপর দিকে। মিনিট কয়েক পরে দাঁড়িয়ে গেল। কান দিয়ে শুনলাম আর একটা লোক উঠে এল গাড়ির মধ্যে।

তিনজনেই কথা বলছে হিন্দিতে। কিন্তু হিন্দি যাদের মাতৃভাষা, তাদের মতো নয়। স্কুলে আমি হিন্দি শিখেছি। তফাত বুঝতে পারি। এক-একজনের হিন্দি বুকনি এক-এক রকম। নানান অঞ্চলের লোক নিশ্চয়।

একজন বললে, ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে দেখতে পাচ্ছি।

আর একজন বললে, করছে কী?

ঢাল বেয়ে নামছে। গেমস ফ্রীক তুলে দেখছে। বাড়ির দিকে ছুটছে।

এরপর আসবে মা।

মায়ের নাম করতেই আমি ছটফটিয়ে উঠেছিলাম। পরে মাকেও তুলে আনবে নিশ্চয়। ফিতে থেকে দু'হাত টেনে বের করবার চেষ্টা করেছিলাম। এই

লোকগুলোকে লাফিয়ে শায়েস্তা করে মাকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, পুলিশকে খবর দিতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু আমাকে পোকার মতো পিষে রেখেছিল প্রথম লোকটা। যে আমাকে তুলে এনেছিল। তার গায়ে অসুরের মতো জোর।

গাড়ি থেমেছিল অনেক অনেক পারে…

ড্রাইভ করছিল যে, তার গলার আওয়াজ চোয়াড়ে। বললে, এবার ফোন করা যাক।

শুনতে পেলাম, দরজা খুলে সে নেমে গেল। ফিরে এল একটু পরেই। বললে, কান ফতে।

ফের স্টার্ট নিল গাড়ি। নেমে গেল ঢাল বেয়ে নিচের দিকে। আবার উঠল এঁকাবেঁকা পথে ঘুরে ঘুরে। ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। রোলিং শাটার তোলবার আওয়াজ শুনলাম। নিশ্চয় গ্যারেজ খুলছে। গাড়ি এগিয়ে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ হল। পিছনের দিকে লোলিং শাটার নেমে আসার আওয়াজ শুনলাম।

আমার পায়ের ফিতে খুলে দিল একজন। বললে, আয়।

এই সময়ে টানা হ্যাচড়ায় থলি সরে গেছিল চোখের ওপর থেকে।

দেখলাম, রয়েছি একটা গ্যারেজের মধ্যে। গাড়িটাও দেখলাম। সাদা রঙের ভ্যান গাড়ি। ধুলো বোঝাই। পাশের দিকে নীল রঙে কি যেন লেখা। পড়বার আগেই হ্যাচকা টানে সরিয়ে এনে আমাকে নিয়ে গেল একদিকে।

কর্কশ কণ্ঠে বললে, সামনে সিঁড়ি। পা তোল।

বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে টের পেলাম সিডির ধাপ।

কিন্তু নড়ছি না দেখে আমাকে ঝটকান মেরে কাধে তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে নামিয়ে দেওয়া হল মেঝেতে।

চোখের ওপর থেকে থলি ফের একটু সরে গেছিল। দেখতে পেলাম একটা ফাঁকা ঘর। ছোট্ট। ফার্নিচার-টার্নিচার নেই।

কিন্তু একটা চেয়ার ছিল পিছনে। আমাকে ঠেলে বসিয়ে দিল তাতে।

হেঁড়ে গলা বললে, থলি তোল। ছোঁড়ার মুখটা দেখি।

পিছন থেকে একজন টেনে তুলল থলি। আমি দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক পেল্লায় পুরুষ। খুব ঢ্যাঙা, মাথাটা প্রায় ঠেকছে গ্যারেজের ছাদে। খুব কালো। কপালে, চোখের নিচে, দু'গালে গোল গোল কালচে দাগ-যে ছ্যাকা মেরে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। চামড়া পুড়ে গেছিল। এখন শুকিয়ে গেছে। বীভৎস! মাথায়, গালে, ভুরুতে-কোথাও চুল নেই।

আমি শিউরে উঠেছিলাম। কানেব কাছে একজন বললে—আফ্রিকার কাফ্রি। বদমাইসি করিসনি। কাঁচা খেয়ে নেবে।

কাফ্রি দানোটা চিবিয়ে চিবিয়ে হিন্দিতে বললে, ঢুকিয়ে দাও বাক্সে। সঙ্গে সঙ্গে একজন ফের ফিরে জড়িয়ে দিল আমার দু'পা এক করে। মাথায় তুলে নিয়ে গেল বাইরে—ঠাণ্ডা বাতাসে। তখন নিশ্চয় রাত নেমেছে। শীত কড়া। ঠেলেঠুলে আমাকে ঢুকিয়ে দিল একটা কফিনের মতো প্লাস্টিক বাক্সের ভেতরে। উঠে বসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ধাক্কা মেরে শুইয়ে দিল চিৎ করে। ডালা বন্ধ করে দিল মাথার উপর। বুঝলাম, শূন্যে তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাক্সা। তারপর স্পষ্ট টের পেলাম, বাক্স ফেলে দিল কুয়োর মতো একটা গর্তের নিচে। দড়াম করে বাক্স আছড়ে পড়ল নিচে। কী যেন ঝুরঝুর করে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে লাগল বাক্সের ওপর। আমার মুখের ইঞ্চি কয়েক ওপরে বাক্সের ডালার ওপরে। বেড়েই চলল সেই প্রপাত-শব্দ।

গায়ে কাঁটা দিয়েছিল তখনই।

বুঝেছিলাম, জ্যান্ত কবর দিচ্ছে আমাকে।

২৮. অ্যালোপেসিয়া আতঙ্ক

২৮. অ্যালোপেসিয়া আতঙ্ক

নাইজেল জাতে আফ্রিকান। ডেয়ারিং ডেকয়েট। মানে, অসম সাহসিক ডাকাত। সাউথ আফ্রিকা কাঁপিয়েছে এককালে। যত রাগ সাদা চামড়ার মানুষের ওপর। সাদাদের অত্যাচার কালোদের ওপর জন্ম জন্ম ধরে চলে আসছে… যাবে।

এই নাইজেল রূপান্তরিত হয়ে গেছিল একটা টেরিবল শক খাওয়ার পর। মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছিল বেস্ট ফ্রেণ্ড। ছ মাসের মধ্যেই খসে গেছিল সমস্ত চুল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব জায়গা থেকে।

সবাই ভেবেছিল কুষ্ঠ-টুষ্ঠ জাতীয় কুৎসিত রোগ ধরেছে। আফ্রিকা তো রোগের ডিপো। এই কালো মহাদেশেই নাকি প্রথম মানুষ এসেছিল। নাইজেলও নিশ্চয়ই এক রূপান্তরিত মানব-এই অ্যাটমিক যুগে।

ডাক্তাররা বললেন অন্য কথা। এটা একটা রোগ। মেন্টাল শক থেকে এসেছে। সমস্ত চুল, সমস্ত লোম ঝরে যায়। মাথা থেকে, ভুরু থেকে, চোখের পাতা থেকে, গায়ের চামড়া থেকে। নির্লোম মানুষ হয়ে যায়। লোম আর চুল ফের গজাবে কিনা, কেউ তা বলতে পারে না। মেডিক্যাল সায়ান্সে যতই এগোক, অনেক হেঁয়ালির সমাধান এখনও করে উঠতে পারেনি।

অ্যালোপেসিয়া মানে টাক পড়া নয়। অন্য ব্যাপারে। মেয়ে আর বাচ্চাদেরও হতে পারে। এ রোগে যন্ত্রণা হয় না, প্রাণ যায় না। কিন্তু আত্যন্তিক দুর্ভোগটা থাকে মনের মধ্যে। চুল দেখেই মানুষ চেনা যায়। নির্লোম মানুষকে শনাক্ত করা মহা মুশকিল।

তাই কালো মহাদেশের একটা কালো সংঘ-গুপ্ত সমিতি—একটা নির্মম ব্যবস্থা নিয়েছিল নাইজেলকে চেনবার জন্যে। গাঁজার কলকের মতো ছোট স্টিল পাইপ

আগুনে তাতিয়ে চিত্রবিচিত্র করে দিয়েছিল নাইজেলের গোটা মুখমণ্ডল।

আমি, ইন্দ্রনাথ রুদ্র, তা জানলাম কী করে?

ক্রমশ প্রকাশ্য। সহৃদয় পাঠক এবং সর্বাণীরূপিনী পাঠিকা (সর্বাণী মানেই যে মা দুর্গা, তা কি ব্যাখ্যা করতে হবে?) তো জানেন, লেখক যখন কলম ধরেন, তখন তিনি দিব্যদৃষ্টি পান—আমি শ্রীহীন ইন্দ্রনাথ রুদ্রও এই মুহূর্তে কলম ধরেছি…

তাই ছুঁয়ে গেলাম অ্যালোপেসিয়া আতঙ্ক-মানবকে। যাকে দেখে শিউরে উঠেছিল কল্পনা আর রবি রে'র ছেলে সোমনাথ।

নাইজেল রহস্য আর একটু বিশদ করতে হবে? কলমবাজ লেখকরা টেলিপ্যাথিও জানে বইকি। পাঠক-পাঠিকার মনে অন্দর-কন্দরের অভীপ্সা তাদের অজানা থাকে না। জানা না থাকলে লেখাই যায় না।

তাই, ঔৎসুক্য নিবৃত্তির চেষ্টা করা যাক ছোট্ট একটা সংবাদ দিয়ে।

দুর্ধর্ষ ডানপিটে রবি রে'র জীবন কাহিনী সংক্ষেপে শুনিয়ে গেছি আগে। পাঠক এবং পাঠিকা জেনে গেছেন, রবি তার দুর্নিবার কৌতূহল নিয়ে হিরে খনি, হিরে মাজাঘষার কারখানা, হীরে বিক্রির মার্কেট দেখে এসেছে ভূমণ্ডলের বহু জায়গায়। সাউথ আফ্রিকার প্রাকৃতিক হিরক ভাণ্ডারের প্রসঙ্গও তখন এসে গেছি। সেখানকার পাহারাদাররা কতখানি ঈগল চক্ষু হয়, সে কথাও বলা হয়ে গেছে।

নাইজেল, নিঠুর নির্লোম নাইজেল, এই রকমেরই এক হীরক খনিব শাস্ত্রীরূপে মোতায়েন ছিল একদা।

বাকিটা অনুমেয়। তীক্ষ্ণধী পাঠক এবং সহজবুদ্ধির পাঠিকা নিশ্চয় তা ধরে ফেলেছেন।

হ্যাঁ। নাইজেল চেনে রবিকে। রবি চেনে নাইজেলকে।

সুফি'র কথা একটু আগে বলেছি। আমি যার নাম দিয়েছি অ্যালোপেসিয়া হা। নির্লোম দৈত্য। প্রেমচাঁদের বিশ্বব্যাপী অপরাধী অন্বেষণের গুপ্ত কর্মকাণ্ডে সৃষ্টি তার দক্ষিণ হস্ত! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পদ্ধতিতে বিশ্বাসী বলেই প্রেমচাঁদ আজ বিশ্বজোড়া গোয়েন্দা সংস্থা। ভাবতেও ভাল লাগে। একসঙ্গে পড়েছি তো স্কটিশ চার্চে।

সুফি যেন হাওয়ায় উড়ে এল আমার পাহাড়ি বাড়িতে। কি করে এল, কোত্থেকে এল, সে সব প্রসঙ্গ অবান্তর। সুফি এসে গেল। অ্যালোপেসিয়া হাল্ককে দেখে পুলিশ পুঙ্গবীর চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল।

কিন্তু থমকে গেছিল রবি রে।

হ্যাঁ। রবি রে-ও পবন বেগে চলে এসেছিল পাহাড়ের বাড়িতে। ছেলে নিখোঁজ হলে। কোনও বাবাই স্থির থাকতে পারে না।

সে এসেছিল আমার ওপর রাশি রাশি সন্দেহ নিয়ে। মানুষের মন বড় বিচিত্র। আমি তার প্রিয়তম বন্ধু। তাই তার একদা প্রিয়তমা স্ত্রীর পিছনে চর হিসেবে মোতায়েন করেছিল আমাকে। সে জানত, আমার ওপর কল্পনার দুর্বলতা আছে। আরও জানত, আমি কলিযুগের ভীষ্ম। ছলাকলা দিয়ে কীভাবে ললনা—ছলনা-ব্যহ ভেদ করি, তা তার অজানা নয়। বিশেষ করে মোমের হাত' কেসটার পর থেকে। তাই নির্ভয়ে আমাকে মোতায়েন করেছিল দুর্লভ হিরেগুলোকে যেন উদ্ধার করে আনি কল্পনার গর্ভ থেকে।

'গর্ভ' শব্দটায় যদি কুঞ্চন জাগে পাঠিকার, আমি নিরুপায়। কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ চিন্তা করলেই বুঝবেন, ওরকম নিরাপদ আর একান্ত গোপনীয় স্থান ভূমণ্ডলে আর কোথাও নেই। তাই গর্ভ শব্দটাকে উপমা হিসেবে টেনে আনলাম আমার এই দুর্বল লেখনী দিয়ে।

মোদ্দা কথা, আমি ছিলাম রবি রে'র চর। অতীব বিশ্বাসযোগ্য স্পাই। অথচ দেখুন, নারী তাদের অসীম ক্ষমতা প্রয়োগ করে কত অসম্ভব কাণ্ডই না করে। ফেলে।

টেলিফোনে রবিকে আরও কি বলেছিল কল্পনা, আমরা তা জানার কথা নয়। কিন্তু সে আমার সামনে এল এক্কেবারে ভিন্ন রূপে, সেই অভিন্ন বন্ধুত্বের বাষ্পটুকুও চোখের তারায় অথবা বাক্যবর্ষণে না দেখিয়ে। সে এল মন থই থই সন্দেহ নিয়ে। সঙ্গে একজন ডিটেকটিভকে নিয়ে। মারদাঙ্গা টিকটিকি।

বক্তব্য অতীব পরিষ্কার। সোমনাথকে আমিই কিডন্যাপ করিয়েছি। পথের কাঁটা ভেবে। কল্পনাকে নইলে পাব কী করে? সেইসঙ্গে তার হিরে? পুলিশ-পুঙ্গবীর নয়ন-তারকায় দেখলাম সেই একই সান্দেহের ছায়াপাত!

দশরূপা নারী। তাই তো তোমাদের দশ দিক থেকে প্রণাম করে শ্রীহীন এই ইন্দ্রনাথ রুদ্র-কিন্তু কাছে ঘেঁষে না।

কি বিপাকেই না পড়েছিলাম সেদিন। ত্রাতারূপে এল সুফি। ভুবনজোড়া পাতা জাল থেকে নিমেষে গোপন খবর চলে আসত প্রেমচাঁদের স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রিত কন্ট্রোল কেবিনে।

দুর্ধর্ষ নাইজেল যে হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেছে, সে খবর তার কাছে চলে গেছিল। তাই ক্ষুর বুদ্ধি খাটিয়ে চকিত সিদ্ধান্ত নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল সুফিকেআর এক নির্লোম মানবকে।

চিত্ত যার গ্র্যানাইট দিয়ে গড়া—শরীরটা সিনেটার হাল্ক-এর মতো।

ও হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। কাহিনি পরম্পরা রক্ষা করা বড় কঠিন ব্যাপার। আমি লেখক নই। আমাকে মাপ করবেন।

সুফি একা আসেনি। সঙ্গে এনেছিল একটা সারমেয়কে। বিশেষ জাতের কুকুর। আফ্রিকায় তার পূর্বপুরুষরা নেকড়ে-টেকড়ের বংশধর ছিল। গন্ধ শুকতে ওস্তাদ। হাওয়ায় গন্ধ থাকলেও তার গন্ধ-যন্ত্র টের পায়। এমনকি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় যখন আসন্ন, তার ষষ্ঠ অথবা সপ্তম অথবা নবম ইন্দ্রিয় তা টের পায়। ইন্দোনেশিয়ায় যখন ভীম ভৈরবে সুনামি আছড়ে পড়েছে, তার অনেক আগেই নিকোবর থেকে প্রেমর্চাদের এক টিকটিকিকে নিয়ে সে চম্পট দিয়েছিল নিরাপদ অঞ্চলে।

টিকটিকি মানে যে ডিটেকটিভ, তা নিশ্চয় ক্ষুর বুদ্ধি পাঠক-পাঠিকাদের নতুন করে বলার দরকার নেই।

আশ্চর্য এই সারমেয় সহ সুফি নেমে গেল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ঠিক সেইখানে, যেখান থেকে আর পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি সোমনাথের।

বাতাসের মধ্যে নিশ্চয় একটা গন্ধ ধরে ফেলেছিল সারমেয়। গজায়নি, তর্জায়নি। নিঃশব্দে দৌড়েছিল পাথুরে পথ বেয়ে।

বুঝেছেন কিসের গন্ধ?

ডিজেলের।

২৯. সোমনাথ যখন কফিনে

২৯. সোমনাথ যখন কফিনে

রবি রে যে ডিটেকটিভ নামক বস্তুটিকে সঙ্গে এনেছিল আমাকে কাত করার জন্যে, তাকে দেখতে অনেকটা সিনেমার ব্যামবোর মতো। গুলি গুলি চোখে বরফ শীতলতা, হাত-পা গর্দানের পেশিগুলো ইস্পাতের তার বললেই চলে। রবি আমাকে চেনে। আমি নবনীত কোমল কবি-কবি দর্শনধারী হতে পারি, কিন্তু প্রয়োজনে শরীরী বিভীয়িকা হয়ে যেতে পারি। যুদ্ধের দামামা যখন বাজে মাথার মধ্যে, তখন বিদ্যুৎ খেলে যায় প্রতিটি পেশির প্রতিটি তন্তুতে। ইন্দ্রনাথ সখন নৃশংস হয় এই কাহিনী যাঁরা পাঠ করেছেন, তারা অন্তত জানেন, আমি কি দিয়ে তৈরি।

রবি রে'র তা অজানা নয়। তাই কোত্থেকে জুটিয়ে এনেছে এই র্যামবো মার্কা মস্তানটাকে।

আমি ছিলাম আমার কোয়ার্টারে। পাহাড়ের খাদের ধরে আমাদের এই বাড়িটা ইংরেজি ‘ইউ প্যাটার্নে তৈরি। দোতলা বাড়ি। অনেকগুলো অ্যাপার্টমেন্ট। আমি থাকতাম একটা প্রান্তে, সোমনাথের মা আর এক প্রান্তে। রবি এসে উঠেছিল সেই প্রান্তের অ্যাপার্টমেন্টে—সোমনাথের বাবা যে—তার মায়ের কাছেই তো যাবে। ছেলে এমনই জিনিস। সন্তান যখন বিপদে, তখন বাপ-মা কাছে চলে আসে-বন্ধু। হয় পর। আমে দুধে মিশে যায়, আঁটি যায় বাদ।

আমি তাতে আঘাত পাইনি। এসব ব্যাপারে আমার ভেতরটা পাথর হয়ে গেছে অনেক আগে। কবিতা বউদি আমাকে কলির কেষ্ট বালে খেপায় বটে, কিন্তু সমস্ত সত্তা দিয়ে জানে—অশরীরী, হায়না, চিতা আর গরিলা—এই সব কটি পদার্থ দিয়ে গড়া তার প্রাণপ্রিয় ঠাকুরপো। কিন্তু পাথরও মুচড়ে ওঠে। হে পাঠক, হে পাঠিকা—আপনারা অন্তত তা জানেন।

যাক গে, বড় বেশি নিজের কথা লিখছি। কেন লিখছি? ডায়েরিতে সব্বাই প্রাণ খুলেই মনের কথা লিখে যায়, আমার এই কাহিনিও মাঝে মধ্যে ডাইরি

স্টাইল নিচ্ছে। বিশেষ করে যখন মনে বেদনা আসে।

সেদিনও মনে কষ্ট পেয়েছিলাম। মানুষ তো আমি। বন্ধুকৃত্য করতে কলকাতার আরাম ছেড়ে এই পাহাড়ি মুলুকে এসেছি নিখোঁজ হিরের সন্ধানে। যে হিরে আছে পাথরের ডিমের মধ্যে, যে হিরে আর পাওয়া যায়নি।

যাবে কি করে? নাটের গুরু যে কল্পনা। এই কারণেই রবি আমাকে লেলিয়ে দিয়েছিল। তার একদা অর্ধাঙ্গিনীই সাত পাকে বেঁধে বিয়ে করা বরের কানে ফুসমন্ত্র দিয়ে তাকে ঘুরিয়ে দিল আমার দিকে।

আমি নাকি মনের দিক দিয়ে পাথর? কবিতা বউদি উঠতে বসতে মুখনাড়া। দেয় আমাকে এই একটা পয়েন্টে। তবে কেন সেদিন প্রিয় বন্ধুর বাস্পীভূত অনুরাগের প্রত্যাবর্তন দেখে আমি অত কষ্ট পেয়েছিলাম?

বহুদর্শিনী পাঠিকা নিশ্চয় মুচকি হাসছেন। মনে মনে বলছেন, কত রঙ্গ দেখলাম ইন্দ্রনাথ রুদ্রের, দেখছি আর এক রঙ্গ। আগুন কাছে থাকলে ঘি গলবেই। ইন্দ্রনাথ তো ছার!

যে যা ভাবে ভাবুন, আমি বলে যাই আমার কাহিনি। ছোট করে।

রবি রে’র র্যামবো ডিটেকটিভ রক্ত চোখে আমাকে বললে, কোথায় রেখেছেন ছেলেটাকে?

সুফি ওর হাল্কা মার্কা বডিটাকে আমাদের মাঝখানে এনে ফেলে বললে, শাট আপ।

আমি আপার কাট’ ঝাড়ব কিনা যখন ভাবছি, পাহাড়ের মেয়ে সেই পুলিশ পুঙ্গবী পাথুরে গলায় বললেন, ব্যস বস, আর না। কোস্তাকুতি নট অ্যালাউড। পুলিশ টেক আপ করেছে কিডন্যাপিং কেস। আপনারা হেল্প করতে চান, করুন, প্লীজ, ফাইট করবেন না। লকআপে ঢুকিয়ে দেব।

কড়া গলা পর্বত কন্যার। তার পরেই সুর নরম করে বললেন, সোমনাথের কমপিউটার রয়েছে। বাচ্চারা ই-মেল নিয়ে অনেক কাণ্ড করে। সেই খোঁজ করছে। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। সে যদি নিজেই নিজেকে কিডন্যাপ করে থাকে, তা ফাঁস হয়ে যাবে। আমার তো তাই মনে হয়। ডিভোর্সি দম্পতির ছেলেমেয়েরা ইনসিকিওরড ফিল করলে এমনটা করে। আকছার ঘটছে। এখন—সুফির অপার্থিব আকৃতির কুকুরটাকে দেখিয়ে-এর নাকের হেল্প নেওয়া যাক।

তখনই কুকুর নামানো হয়েছিল শেষ পদচিহ্ন যেখানে দেখা গেছিল—সেখানে। সে যে গন্ধটা শুকে চনমনে হয়ে উঠেছিল, সুবুদ্ধি পাঠক এবং পাঠিকা ত অনেক আগেই ধারে ফেলেছেন…

ডিজেলের গন্ধ!

এবার দেখা যাক, কফিনের মধ্যে সোমনাথ কী করছে। পাঠক এবং পাঠিকা, আপনারা তো অনিমা, লঘিমা প্রমুখ অষ্টসিদ্ধি করতলগত করে বসে আছেন। আপনাদের অজানা, আপনাদের অগম্য কিছুই নেই এই ত্রিভুবনে। সুতরাং…

সোমনাথের মাথার ওপর দেখা গেছিল একটা আলোক বিন্দু। বহু দূরের নক্ষত্রের মতো ঝিকিমিকি আলোক কণা, সকালের দিকে। নিশ্চয় বাতাসের ফটো কেটে রাখা হয়েছে কফিনেব ডালায়। সেই ফুটোয় চোখ লাগিয়ে সে দেখেছিল, টিউবের মধ্যে দিয়ে বহুদূরের এক কণা নীল চাকতি।

ফুটোয় মুখ ঠেকিয়ে, মুখের দু'পাশে দু'হাতের চেটো জড়ো করে চেঁচিয়েছিল তারস্বরে—বাঁচান! বাঁচান! আমি এখানে—মাটির তলায়! হেল্প! হেল্প মি: আই অ্যাম ডাউন হিয়ার!

কেউ জবাব দেয়নি।

হেল্প!

সারারাতে অনেক মেহনৎ করেছে সোমনাথ। ফিতের বাঁধন থেকে মুক্ত করেছে দু'হাত আর দু'পা। লাথিয়ে ভাঙবার চেষ্টা করেছে কফিনের প্লাস্টিক দেওয়াল। কিডন্যাপাররা নিশ্চয় চম্পট দিয়েছে এতক্ষণে। কেউ জানে না একটা জ্যান্ত

ছেলেকে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করে শুইয়ে রাখা হয়েছে মাটির নিচে। পেটের জ্বালায়, তেষ্টার কষ্টে পটকে যাবে যথাসময়ে—কেউ জানতেও পারবে না। অনেক লাথিয়ে, অনেক চেঁচিয়ে শেষকালে বেদম হয়ে ঘুমিয়ে নিয়েছিল। এক চোট। তার পরেই ফের শুরু হয়েছিল হাত-পা ছোঁড়া আর মা-মা চিৎকার।

আর তারপরেই কে যেন কাঁৎ করে একটা লাথি কষিয়েছিল তার পেটে। পরক্ষণেই যেন দশ হাজার ভোল্টের ইলেকট্রিক শক গোটা শরীরটাকে স্থান করে দিয়েছিল এক চাবুকেই। বৈদ্যুতিক চাবুক।

চোপ। চেঁচাবি না?

বাক্সের কিনারায় উঁকি দিচ্ছে গেমস ফিকের সেই মারকুটে কালিকা রানি। চাহনিতে জিঘাংসা!

চিল চিৎকার করে সোমনাথ বলেছিল, তুই তো সত্যি নস! মিথ্যে!

তাই নাকি? তাহলে খ আর একটা লাথি। লাগবে না। আমি তো মিথ্যে!

ককিয়ে উঠেছিল সোমনাথ।

আর তখনই চোখে পড়েছিল কালিকা রানির আঙুলের লম্বা লম্বা নখের ঝিলিক। ছুঁচোলো নখ, ছুরির ফলার মতো, ঝকঝকে। এই নখ চালিয়ে শত্রুকে ফালাফালা করে দেওয়ার অদ্ভুত কমব্যাট কৌশল গেমস ফিক খেলনায় দেখিয়েছে কালিকা রানি।

এখন দেখাবে নাকি সোমনাথকে? শিউরে উঠে সিটিয়ে গেছিল দশ বছরের ডানপিটে।

দশ আঙুল-নখের দশখানা ছুরি সোমনাথের চোখের সামনে দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেছিল কালিকা রানি–গাধা কোথাকার। ধার দেখেছিস ডগায়? দশখানা তুরপুন। ফুটিয়ে দিলে–

আমি বাড়ি যাব।

দেব তোর পেট চিরে—ফের যদি চেঁচাবি।

মা…মা…

তবে রে! কালিকা রানি লাফিয়ে আসতেই… তিড়বিড়িয়ে ছিটকে যেতে গেছিল সোমনাথ। আর ঠিকতখাই, প্যান্টের পকেটে থাকা জিনিসটা প্যাট করে ফুটে গেছিল উরুর চামড়ায়। রুপোর সেই তারকা। যা সে পেয়েছিল… ইন্দ্রনাথ রুদ্রের কাছে প্রেজেন্টেশন হিসেবে-সময় মতো কাজে লাগিয়ে মস্ত বীর হওয়ার জন্যে…

এসেছে সেই সময়!

দুঃস্বপ্ন তিরোহিত হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কালিকা রানি ধরিয়ে দিয়ে গেছে কফিন কেটে বেরোনোর হদিশ।

পঞ্চকোণ রজত তারকা দিয়ে সেই মুহূর্তে প্লাস্টিক কফিনের ডালা কাটতে শুরু করেছিল সোমনাথ। ছুরির মতো ধারালো প্রতিটা ডগা। আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছিল কাটা হল কতখানি। চোখে পড়েছিল এক লাইনের ক্ষীণ আকাশ।

বিপুল উদ্যমে মরিয়া ছেলেটা পঞ্চকোণের পঞ্চ ছুরি চালিয়ে চালিয়ে কেটে কেটে গেছিল কফিনের ঢাকনা। ঝুরঝুর করে প্লাস্টিকের গুঁড়ো ছড়িয়ে গেছিল সারা গায়ে…

ঠিক সেই সময়ে দুই কিডন্যাপারের মধ্যে কথা চলছে এইভাবে :

অ্যালোপেসিয়া আতঙ্ক—ছেলেটাকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।

মর্কটপ্রতিম সাগরেদ (যে চালিয়েছে সাদা ভ্যান) : কিসের চিন্তা? ছোঁড়া রয়েছে তিন ফুট ধুলোর নিচে।

বেঁচে আছে কিনা একবার দেখা দরকার। তারপর ফোনে জানিয়ে দিতে হবে পার্টিকে—হিরে চাই, নইলে পাবে লাশ।

মর্কট কিডন্যাপার রিভলভারটা ট্রাউজার্সের পকেটে ঢুকিয়ে পা বাড়িয়েছিল গ্যারেজের দিকে।

অ্যালোপেসিয়া ততঙ্ক বলেছিল পেছন থেকে—হিরে না পেলে করবি কি ছোঁড়াটাকে নিয়ে?

পদক্ষেপে বিরতি না দিয়ে বলেছিল মর্কটাকৃতি ড্রাইভার—বাক্সের ফুটো বন্ধ করে দেব।

এই যে এত ঘটনা ঘটে চলেছে সিকিমের পাহাড়ি অঞ্চলে, যেখানে ঘটছে, সেই জায়গাটা নিয়ে একটা শব্দও লেখা হয়নি এতক্ষণ। কাহিনির মূল টানে ভেসে গেছিলাম যে। তাছাড়া সাহিত্যের রস বিতরণেও আমি অপারগ! মৃগাঙ্ক লিখতে বসনে। শুধু প্রাকৃতিক বর্ণনায় কাহিনি ভরিয়ে দিত।

কিন্তু আমি নেহাতই অকবি—চেহারায় যদিও অন্যরকম। তাই ছোট্ট করে ছুঁয়ে যাচ্ছি রোমাঞ্চকর এই প্রাণ নিয়ে টানাটানির লীলাক্ষেত্র সম্পর্কে দু'চার কথা।

সিকিমে খেচিপেড়ি নামে একটা লেক আছে। এই লেক লেপচাদের কাছে বড় পবিত্র হ্রদ! উচ্চতায় এক হাজার আটশো কুড়ি মিটার। এই সরোবরের চারদিকে সারি সারি পতাকা ওড়ে সারবন্দী খুঁটির ডগায়। কৌতূহলোদ্দীপক একটা কিংবদন্তী আছে এই সরোবর সম্পর্কে। এত তো গাছ সরোবর ঘিরে। কিন্তু গাছের পাতা পড়ে না সরোবরের জলে। পড়লেই ছোঁ মেরে সেই পাতা তুলে নিয়ে যায় একটা na একটা পাখি। বিশুদ্ধ জলকে অশুদ্ধ হতে না দেওয়ার মহান দায়িত্ব যেন এখানকার বিহঙ্গকুলের। তাই সরোবর সব সময়ে টলটলে স্বচ্ছ-দর্পণপ্রতিম।

এ সরোবরের নাম ইচ্ছাপূরণের সরোবর। যারা বৌদ্ধ, যারা লেপচা, তারা বিশ্বাস করে-কল্পতরু সরোবর কারও মনের বাসনা অপূর্ণ রাখে না। দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়।

কুলিশ কঠোর এই কাহিনির মাঝে আচমকা ইচ্ছাপূরণের লেকের কথা নিয়ে এলাম কেন, তা জানতেই অবশ্যই আগ্রহী হয়েছেন নিবিষ্ট পাঠক এবং পাঠিকা।

কারণ আছে…কারণ আছে…ব্যাপারটা যদিও গভীর গোপন—কিন্তু দৈবাৎ আমি জেনে ফেলেছিলাম।

এই সরোবরের পাড়ে একদা হানিমুন করতে এসেছিল কল্পনা আর রবি। তখন দুজনেরই চোখে অনেক…অনেক স্বপ্নের রামধনু…যে রামধনু কিছু দূরের কাঞ্চনজংঘা। ফলস থেকে বিচ্ছুরিত সুর্যের সাতটা রঙের রামধনুকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল। ইচ্ছাপূরণ সরোবরের পাড়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে দু'জনে নিবেদন করেছিল

একটাই ইচ্ছা : ছেলে হোক আমাদের।

এসেছিল সেই ছেলে–সোমনাথ।

আর সেই ছেলেই জ্যান্ত কবরস্থ হতে চলেছে এই অঞ্চলেরই গভীর গোপন। একটা সদ্য গড়ে ওঠা রিসর্টে। সোজা বাংলায় যা বদমাইসি করার আখড়া। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘেরা এমন নিরালা জায়গাতেই তো শরীরী প্রেম জমে-বিয়ে না করেই—জমে পরকীয়া লীলা যা লাম্পট্যের অপর এক নাম। এখানকার ঘরে ঘরে চলে পর্নো সিডি…তোলাও হয় পর্নো ভিসিডি…যে বস্তুটার রমরমা ব্যবসা শুধু ভারতের মেট্রো সিটিগুলোতেই আটকে নেই—চালান যাচ্ছে বিদেশে…ভারতীয় লাস্যময়ীদের নগ্ন কেচ্ছার বাজার যে সেখানে অনেক বেশি। অশালীন ছবির বাজার যুগ যুগ ধরে রমরমা থেকেছে তামাম দুনিয়ায়। কিন্তু সেই শিল্পে এখন ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে এমন ফলের রস যার মধ্যে থাকে শরীর তাতানো আর নাচানোর মাদক দ্রব্য, বেশরম হওয়ার মতো দ্রব্য, হেসে কুটিপাটি হওয়ার জন্যে ঘরময় ছড়িয়ে দেওয়া হয় লাফিং গ্যাস, জুগিয়ে যায় মনের আনন্দ আর প্রাণের আরাম, খোদ ডেভিলকে বন্দনা করে ডেয়ারিং অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের এমন জায়গা তো পাহাড়ী অঞ্চলেই নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাওয়া যায়…।

সোমনাথ জীবন্ত কবরস্থ হতে চলেছে রমরমা এই রিসর্টের সন্নিকটে।

ঠিকানা? দুঃখিত। জানতে চাইবেন না। সবইনফরমেশন সবাইকে দেওয়া যায় না।

রিসর্টটার নাম?

তন্ত্রমন্ত্র।

উদ্দামতার আড্ডা তন্ত্রমন্ত্র। নিরিবিলিতে নষ্টামি করার রিসর্ট তন্ত্রমন্ত্র। ইণ্ডিয়ান পুলিশের নাগালের বাইরে—অথচ কোটিপতি ইণ্ডিয়ানদের লাম্পট্য চলে এইখানেই। ইন্ধন জুগিয়ে যায় বিবিধ নারকোটিক; যেমন, এক্সট্যাসি, জিএইচবি

অথবা লিকুইড এক্সট্যাসি, মিথ্যামফিটামাইন বা স্পীড, ফেটামাইন বা কে অথবা ক্যাট ভেলিয়াম, রোহিপনল অথবা ফিজ বা ফরগেট মি বড়ি, নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাস, এলএসডি—যা অ্যাসিড। এর সঙ্গে চলে মাতাল করার মিউজিক আর স্ট্যাকাটো ড্যান্স। শরীর তখন শরীরে লেগে যায়…এক শরীরের টান আর এক শরীর রুখতে পারে না…রুখতে চায় না…

থাক আরও বর্ণনা। বিধাতার নির্মম প্রহসনের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়ার জন্যেই নক্কার জনক প্রসঙ্গে কিছুটা ছুঁয়ে গেলাম। এ হেন নরকের কাছেই নির্মিত হতে চলেছে আর এক নরক…

সোমনাথের জীবন্ত কবর!

সোমনাথের ধমনীতে বইছে কিন্তু রবি রে'র রক্ত। বংশগতির মহিমা দেখিয়ে গেছিল কফিনে চিৎ অবস্থায় শুয়ে। হাতের মুঠোয় ইন্দ্রনাথ রদ্রের রৌপ্যপদক-সিলভার স্টার।

ধারালো কোণ দিয়ে ঘসে ঘসে কেটেছে প্লাস্টিক কফিনের ঢাকনা। ঝুর ঝুর করে ধুলো ঝরেছে, একটার পর একটা কোণ ভোতা হয়েছে, পরপর তিনটে কোণের ধার যখন চলে গেছে, চতুর্থ কোণ দিয়ে কাজ আরম্ভ করতেই দেখেছিল, মাথার ওপর ফুটো দিয়ে তারার আলো আর আসছে না।

পরক্ষণেই ভেসে এসেছিল দুশমন কণ্ঠস্বর, বেঁচে আছিস?

জবাব দেয়নি সোমনাথ।

দুই কিডন্যাপার এসেছে খোঁজ নিতে। কেন জবাব দেবে সোমনাথ?

শোনা গেল কণ্ঠস্বর–নিশ্চয় ঘুমোচ্ছে।

অন্য কণ্ঠস্বর—অথবা মটকা মেরে রয়েছে। এই অবস্থায় কেউ ঘুমোয়?

তাহলে থাক।

নৈঃশব্দ্য ফিরে এল মাথার ওপর। একটু সবুর করল সোমনাথ। রুপোর কোণ দিয়ে ঘষে ঘষে প্লাস্টিক কাটা শুরু হল তার পরেই। খুব আস্তে…খুচ খুচ খুচ করে…আওয়াজ যেন ওপরে না যায়।

অনেক পবে পেয়েছিল কঠোর কেরামতির পুরস্কার। ধুস করে কাটা প্লাস্টিক আচ্ছাদন ধসে পড়েছিল গোটা শরীরটার ওপর। ওপরকার তিনফুট ধুলোর ওজন তো কম নয়।

কিন্তু ঘাবড়ায়নি সোমনাথ। টু শব্দও করেনি। গায়ের জোরে প্লাস্টিক ডালা সামেত ধুলোর বোঝা মাথার ওপর তুলে যখন বেরিয়ে আসছে কবরের গর্ত থেকে, ছুটে এসেছিল দুই কিডন্যাপার। একটু দূরে থাকলেও তাদের চোখ ছিল যে এইদিকেই। পঞ্চানন ঘোষালের ‘অপরাধ বিজ্ঞান’ পুস্তকে এমন কথাই তো লেখা আছে : অপরাধী অপরাধের জায়গায় ঘুরে ফিরে আসে…

তাই তারা প্রথমে দেখেছিল কবরের ঝুরো মাটি তোলপাড় হচ্ছে, তারপরেই দেখেছিল সোমনাথকে উঠে আসতে…

কিন্তু পালাতে দেয়নি। দৌড়ে গিয়ে মুখ চেপে ধরে টেনে এনেছিল গ্যারেজের মধ্যে। আর ঠিক তখনই নিঃশব্দে…অতিশয় শব্দহীন এবং বিদ্যুৎসম গতিতে সুফির সেই ভয়াল সারমেয়-বাতাসে ডিজেলের গন্ধ শুকে শুকে এসেছিল এইখানে…

সাদা ভ্যানের ডিজেল ট্যাঙ্কের ছোট্ট চিড় দিয়ে যেটুকু গন্ধ বেরিয়ে বাতাসে ভেসে থেকেছে, প্রশিক্ষণ পাওয়া শিকারি কুকুরের কাছে সেইটুকুই তো মস্ত ক্লু!

মারামারির বর্ণনাটায় আর গেলাম না। ও সব থাকে হিন্দি সিনেমায়। দুই অ্যালোপেসিয়া আতঙ্ক জ্বলন্ত চোখে কীভাবে চেয়ে থেকে কীভাবে তেড়ে গিয়ে কি কাণ্ড করেছিল, যাক সেসব কথা। আমি ঘায়েল করেছিলাম বেটে মর্কটটাকে রামরদ্দা দিয়ে। ঘাড়ের একটা বিশেষ জায়গায় ঠিকমতো চোট মারতে পারলে মহাবীরও চোখে সর্ষেফুল দেখে। আমি দেখিয়ে ছেড়েছিলাম।

তারপর আমাকেই রিভলভারেব বাঁট চালাতে হয়েছিল ভয়ঙ্কর আকৃতির সেই অ্যালোপেসিয়া আতঙ্কের মাথা টার্গেট করে—যাঁর সারা মুখ ঘিরে চামড়া পুড়িয়ে

দাগানো হয়েছে—’যে গলা টিপে ধরেছিল সুফির।

করোটি চুরমার হয়নি। তবে চোটটা ছিল প্রায় মারাত্মক। অমন প্রহর খেলে মহাবীরও জ্ঞান হারায়।

গ্যারেজ থেকে যখন বেরিয়ে এসেছিলাম, দেখেছিলাম একটু তফাতে নিন্দনীয় প্রমোদকাননের জানলায় জানলায় চমকে চমকে উঠছে বহুরঙের ফ্ল্যাশ…

উল্লাস… উল্লাস… উল্লাস!

৩০. ক্লু

৩০. ক্লু

ভূমিকা আর উপসংহার যত ছোট হয়, ততই ভাল।

গোল টেবিল বৈঠক বসেছিল পুলিশ ডেরায়। চেয়ারপার্সন সেই পুলিশ পুঙ্গী। সিকিমি কন্যা। প্রশিক্ষণের দৌলতে তবর বড় নীরস। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে তার প্রোজ্জ্বল নয়ন তালিকায় যে বিজুলি দেখেছিলাম, তা আমার কর্মজীবনে দেখেছি বহুবার বহু সুন্দরীর চোখে। কিন্তু আমি যে ভীষ্ম, আমি অতিশয় কাঠখোট্টা নারস তরুবর। প্রেম-ট্রেম, বিয়ে-থা, সংসার-টংসার করার ব্যাপারে অতিশয় উদাসীন। আমি খুবই সাধারণ মানুষ। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আমার তুলনা করা চলে। • ম বলে যাব? ক্ষমা করবেন আমার ধৃষ্টতার জন্যে। বিখ্যাত দার্শনিক কান্ট বিয়েই করেননি। বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। 'দ্য ডেক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অব রোমান এম্পায়ার' বইটা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন লেখক এভোয়ার্ড গিব্বন কত বড় লেখক। অথচ পাত্রীর পিতা তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেননি লেখককে জামাই করবেন না বলে। ফলে, গিব্বন সাহেব অকৃতদার রয়ে গেছিলেন সারা জীবন। আমার জীবনের প্রথম দিকে প্রায় এই ধরনের একটা দাগা ছিল, তা অনেকেই হয়তো জানেন। কিন্তু হারবার্ট স্পেনসার? চিন্তার সাগরে ডুবে। থেকেই গোটা জীবনটা কাটিয়ে দিলেন, ললনা-ছলনায় একদম ভুললেন না। বৈজ্ঞানিক নিউটন এমনই আত্মভোলা ছিলেন যে ভাবীপাত্রীকে বিয়ের কথা না বলে তার আঙুল দিয়ে তামাক খাওয়ার পাইপ খুঁচিয়ে সাফ করা শুরু করেছিলেন—বিয়ে আর হল।, উনিও সারা জীবনে বিয়ের চৌকাঠ আর মাড়ানিনি। বিয়ে-টিয়ের মধ্যেই যাবেন, এহেন ধনুর্ভঙ্গ পণ করে সাহিত্যিক ল্যাম্ব, শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, সঙ্গীত গুরু বিঠোফেন, ধর্মগুরু আলেকজাণ্ডার পোপ, লেখক লুই ক্যারল, জোনাথন সুইফট, কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান, হ্যান্স আণ্ডারসন, ভলতেয়ার, ম্যাকলে, মাইকেল অ্যাঞ্জেলো এবং আরও অনেক জগতবরেণ্য পুরুষ। মালা বদলের কথা আজীবন ভাবেননি।

তাই, পুলিশ পুঙ্গবীর নয়ন বাণ আমাকে বিধতে পারেনি। তিনি যে মনের মতো পুরুষের পথ চেয়ে বসেছিলেন, তা জেনেছিলাম পরে। তখন আর আঁখির ভাষা প্রয়োগ করেননি, মুখের ভাষায় এই শর্মাকে কজায় আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি যে নিরুপায়। কবিতা বউদির ওই চোখেব শাসন মনে করলেই আমি পাথর হয়ে যাই।

যাগ গে, যাক গে, কথায় কথায় উপসংহার দীর্ঘ করে ফেলছি। কাজের কথায় আসা যাক।

পুলিশ পুঙ্গবীর ম্যাগনেটিক চাহনি এড়িয়ে গেছিলাম সে সিসের টুকরোর মতো। বলেছিলাম, ম্যাডাম, আপনার সায়েন্টিফিক ইনভেসটিগেশন ডিপার্টমেন্ট তাহলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলিয়ে প্রমাণ পেয়ে গেছে?

পু—পু বললেন, ইয়েস, স্যার। কম্পিউটার ভেরিফিকেশন হয়েছে। সাদা ভানের নানান জায়গায় যে সব আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে বহু ফিঙ্গারপ্রিন্ট নাইজেলের। একদা যে ছিল সাউথ আফ্রিকার মোস্ট ড্রেডেড ক্রিমিন্যাল।

ইণ্টারন্যাশন্যাল পুলিশ তাকে খুঁজছিল?

ইউনাইটেড নেশনের ইণ্টারন্যাশন্যাল ওয়ারক্রাইম অ্যাক্ট অনুসারে।

পৃথিবীজোড়া সন্ত্রাসে যুক্ত বলে?

হ্যাঁ। কিন্তু, মিস্টার রুদ্র, আপনি তা জানলেন কী করে?

ম্যাডাম, আমি যে গোয়েন্দা। এই পৃথিবীর অন্যতম সেরা গোয়েন্দা সংস্থা প্রেমচাঁদ ডিটেকটিভ এজেন্সির কর্ণধার প্রেমচাঁদ মালহোত্রা আমার কলেজ ফ্রেণ্ড। যা কিছু জেনেছি, তারই দৌলতে। সে যে সোর্স ইনফর্মেশন নিয়ে কাজ করে। আমার কেরামতি শুধু বুকের পাটা দেখিয়ে এখানে এসে বসা।

কিন্তু, আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, পুলিশ পুঙ্গবী—আপনি তো এসেছিলেন, ডোন্ট মাইণ্ড ফর মাই ফ্র্যাঙ্কনেস, মিসেস কল্পনা রে-চিটনিসের ফ্রেণ্ড হিসেবে।

এই কথায় আমার পাশের দু’জন আড়ষ্ট হয়ে গেছিল। তাদের একজন কল্পনা, অপরজন রবি।

সোমনাথকে এ ঘরে রাখা হয়নি। সে পাশের ঘরে গেমস ফ্রিক খেলছে। কালিকা রানির চাঁচাঁ চিল্লানি এ ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে।

আমি বললাম, ম্যাডাম, তাহলে একটু খুলে বলা দরকার। পুলিশ, উকিল আর ডাক্তারের কাছে কিছু গোপন করলে ফ্যাসাদে পড়তে হয়। আমি এখানে এসেছিলাম প্রিয়বন্ধু রবি রে’র স্পাই হয়ে।

স্পাই হয়ে! চারুনয়নার দুই চোখে দেখেছিলাম চকিত চমক। একই রিঅ্যাকশন দেখা গেল কল্পনার লবঙ্গলতিকা দেহসুষমায়। কাঠ হয়ে গেল নিমেষে।

আমি আয়েস করে এক টিপ নস্যি নিলাম। তারপর বললাম, দেখুন। ম্যাডাম, রবি আমার কলেজ ফ্রেণ্ড—যেমন প্রেমচাঁদ। শিক্ষাক্ষেত্রের ফ্রেণ্ডশিপ কখনও যায় না যায় কর্মজীবনে। এখন যা বলব, নিশ্চয় তা অফ দ্য রেকর্ড থাকবে?

ম্যাডাম বললেন, এ ঘরে ভিডিও ক্যামেরা বা টেপরেকর্ডার নেই। ঘরোয়া বৈঠক তো। স্বচ্ছন্দে বলুন।

আমি বললাম, কলকাতার শিল্পমেলা থেকে হিরের ডিম চুরি গেছিল—

হিরের ডিম!

হিরের কুচি বোঝাই অনিক্স পাথরের ডিম। তেহরান, পেশোয়ার থেকে আসত হিরের কুচি-চোরা পথে-খনি থেকে চোরাই হিরে—সেই হিরে পেশোয়ারের পাথর কারিগর ফোঁপরা ডিমে ভরে পাঠাত এমন এমন জায়গায়, যেখানে যেখানে রয়েছে টেররিজমের ঘাঁটি। টাকার বদলে হিরে! টেররিজম যাতে অব্যাহত থাকে।

ঈষৎ চমকালেন পুলিশ পুঙ্গবী—ও ইয়েস, এ রকম একটা ভাসা ভাসা মন্তব্য ‘ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম বটে—

২০০২ সালের মার্চ সংখ্যায়?

তা হবে।… তারপর

ইনফরমেশনটা আমার বন্ধু প্রেমচাঁদের কাছেও ছিল। তার জাল পাতা গোটা পৃথিবী জুড়ে। সে জানত, পেশোয়ারের পাথর ডিম ঘুরে ঘুরে চলে আসবে এইখানে-নাইজেলের কাছে।

কেন?

নাইজেল যে হিরে এক্সপার্ট। হিরের খনির পাহারাদার ছিল। হিরে লোপাট করতে গিয়ে ধরা পড়ে। তাই তার মুখ দাগিয়ে দেওয়া হয় ছ্যাকা দিয়ে।

আই সি…, আই সি…

বদলা নেওয়ার জন্যে এই কারবারে নামে নাইজেল। ধর্মে সে খ্রিষ্টান। কিন্তু টেররিজম চালু রাখতে গেলে ক্যাশ কারেন্সি দরকার। তার দরকার টাকার। হিরে আনিয়ে তা ক্যাশ করে নেওয়া হতো। সে ঘাঁটি গাড়ে এখানকার রিসর্টে…

এক মিনিট। হিমাচল অঞ্চলে যে রমরমা রিসর্ট কারবার চলছে, সেখানেও কি আছে হিরের চোরা কারবার?

সরি ম্যাডাম, এ সব প্রেমচাঁদের সিক্রেট। সেখানে পর্নো ফিল্ম ভোলা হয় ঠিকই, বাকিটা উহ্য।

তাহলে বলুন, আপনি ম্যাডাম রে-চিটনিসের ওপর স্পাইগিরি করতে এলেন কেন?

কলকাতার শিল্পমেলায় হিরে চোর ছিল, সেখানকার একটা সংস্থা। তারা চায়নি সেই হিরে যাক টেররিস্টদের কাছে। সেই সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছিল রবি রে'র মাধ্যমে। সেই হিরে এখন রবির জিম্মায়। কাস্টডিতে বলতে পারেন, চোরের ওপর বাটপারি করেছিল রবি। পৃথিবীর মানুষের স্বার্থে। তাই মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে তার ছেলেকে কিডন্যাপ করে—ডিম সেই মুক্তিপণ—যা সে হাওয়া। করেছিল কলকাতার শিল্পমেলা থেকে।

সঙ্কুচিত চোখে, যে চোখ এমনিতেই সাইজে ছোট—তাদের আরও ছোট করে, আমার দিকে প্রায় নরুন চোখে চেয়ে রইলেন পুলিশ পুঙ্গবী।

আমি গ্রাহ্য না করে বলে গেলাম, কল্পনা হিরের জগতের মেয়ে। হিরের ওপর তার দুর্নিবার আকর্ষণ। সব মেয়েদেরই থাকে... না, না ম্যাডাম, আপনার যে আছে, তা বলছি না... তবে এই কল্পনার আছে... বলুক, ওর নেই? তাই চুরি করেছিল রবির প্রাণাধিক ছটা হিরে ভর্তি পাথরের ডিম।

কল্পনা যেন পাথর।

আমি চালিয়ে গেলাম, আমার বন্ধু এই রবি রে তামাম দুনিয়ার সবক'টা হিরের খনির সব খবর রাখে, হিরের বাজারগুলোর নাড়িনক্ষত্র নখদর্পণে রাখে, ঘরের বউকেও বেছে নিয়েছে হিরে মাজাঘযার জায়গা থেকে, দুজনেই দু'টুকরো হিরে, হিরে এদের ভালবাসে, এরাও হিরেদের ভালবাসে-আর বিরোধের সূত্রপাত সেই হিরে প্রেম থেকে।

আমি মঞ্চ অভিনেতার মতো ঈষৎ বিরতি দিলাম বাক্যস্রোতে। পরের কথাটায় শক্তির স্রোত বইয়ে দেব বলে। ওষুধ ধরে গেল। ঈষৎ ঝুঁকে বসলেন পু-পু। অকয়াৎ শিবনেত্র হয়ে গেল দেবা আর দেবী। মানে, রবি আর কল্পনা।

আমি সারেগামা স্বরে চলে গেলাম, ম্যাডাম, যে কোনও হিরের মধ্যে কসমিক এনার্জি ঠুসে দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে, এমন আশ্চর্য এক সেট পাথরের ডিম বিয়ের যৌতুক পেয়েছিল রবি। প্রতিটা পাথরের ডিমের ফাঁপা গহ্বরে ছিল—এখনও আছে-এক-এক রঙের কুচি হিরে। কল্পনা, হিরের বাজারের মেয়ে কল্পনা চেয়েছিল, সেই সেট থাকুক তার কাছে। এ রকম যাজ্ঞা মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু, জহুরি দণ্ডপথ, যিনি এই হিরের ডিমের সেট আর মন্ত্র দান করেছিলেন রবিকে, পই পই করে নিষেধ করে গেছিলেন রবিকে—এমন দুর্বলতা যেন কখনও দেখানোনা হয়।

আবার বিরতি দিলাম বাক্যস্রোতে। আড়চোখে দেখে নিলাম কল্পনার মুখাবয়ব। সে মুখ রাঙা হয়ে গেছে। ফর্সা হয়ে গেছে। ফর্সা মেয়ে তো...।

বললাম, কল্পনা তাই স্বামীর অগোচরে আশ্চর্য হিরেদের খানকয়েক আত্মসাৎ করেছিল। পরিণাম, ডিভোর্স। কল্পনার হেথায় আগমন। আমাকে পিছনে লেলিয়ে দেওয়া। সেটা রবি একা করেনি, প্রেমচাঁদও আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিল-অফিসিয়াল চুক্তি—তার কাছে নেটওয়ার্ক খবর এনে দিয়েছিল, কলকাতার

শিল্পমেলা থেকে হাওয়া হয়ে যাওয়া হিরের ডিমও যেতে পরে কল্পনার খপ্পরে—একই কারণে হিরে প্রেম, হিরে সঞ্চয়, হিরে দেখে ধ্যান।

স্ট্রেঞ্জ, ঈষৎ নাসিকাধ্বনি সহ বললেন পু—পু।

এক্সট্রিমলি, আমি বললাম অহীন চৌধুরি ঢঙে-কল্পনা অবশ্য হিরের চোরাচালানি আর টেররিস্ট গ্যাংয়ের পার্টনার নয়। কিন্তু পেশোয়ার থেকে অনিক্স পাথরের ডিম কলকাতার শিল্পমেলার মধ্যে দিয়ে পাঠানো হচ্ছিল যাদের কাছে, ক্ষিপ্ত হয়েছিল তারা।

তাদেরই একজন এই নাইজেল? পু-পু বললেন মিহি গলায়।

ইয়েস, ম্যাডাম, ইয়েস। তাই তারা কল্পনাকে আর রবি রে-কে টাইট মেরে হিরে উদ্ধারের জন্যে সোমনাথকে কিডন্যাপ করে–টেলিফোনে মুক্তিপণ চায়… কী?

ডিম।

ওদের এই অ্যাকশন প্ল্যান অজানা ছিল আমার কাছে। কিডন্যাপিংয়ের একটা প্লাবন চলেছে ভারত জুড়ে—সেই প্লাবন যে সিকিমের এই গণ্ড পাহাড়ে আছড়ে পড়বে, এটা আঁচ করলে আমি আরও একটু সতর্ক হতাম। সোমনাথকে একলা ছাড়তাম না। আমার নজর ছিল কল্পনার দিকে। সে যেন টার্গেট না হয়—হিরে তো তার আগের স্বামীর কাছে-তার ছেলের কাছে তো নেই। ভুল করেছিলাম এইখানেই।

মানুষমাত্রই ভুল করে, মৃদুস্বরে সান্ত্বনা দিলেন পু-পু-শয়তানে করে না।

সত্যি কথা বলতে কি, পুলিশ পুঙ্গবীর এ হেন মৃদু বচন বিপুল স্বস্তিবোধ এনে দিল আমার মধ্যে। আমি বলে গেলাম-কিছু হিরে যার কাছে, চোখে চোখে রাখি তাকে, এই ছিল আমার গেমপ্ল্যান। কল্পনা ভেবেছিল উল্টো-বন্ধুর ডিভোর্সি বউয়ের দিকে নিশ্চয় নেকনজর দিয়ে চলেছি।

ঠিক এইখানে নিতান্তই বেরসিকের মতো গলা খাঁকারি দিয়ে বসল বন্ধুবর রবি রে। বললে, আমি কিন্তু তোকে ঠিক সেই রোলটাই প্লে করতে বলেছিলাম।

আমি বললাম, মাই ডিয়ার রবি রে, আগুনে হাত দিয়ে পুড়ে মরব নাকি? তবে হ্যাঁ, সেই আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংয়ে তোর অ্যাকটিংটা হয়েছিল অনবদ্য-সোমনাথ কিডন্যাপড় হয়ে গেছে শুনে তুই মিসাইলের মতো এমন চার্জ করে বসলি আমাকে, যেন সত্যিই কল্পনাকে ক্যাচ করার জন্যে পথের কাঁটা সোমনাথকে ভ্যানিশ করে। দিয়েছি আমিই।

ঠোঁটের কোণে কোণে নিগূঢ় হাসির মাকড়সা জাল ছড়িয়ে রবি বললে, হে বন্ধু, তুমি একাই অ্যাকটিং শেখোনি। স্কটিশ তুই ছিলিস হ্যালির ধুমকেতু, আমি ছিলাম–

পু-পু বললেন, কাট শর্ট! কাট শর্ট!

আমি বললাম, চেয়ার পার্সনের অর্ডার হয়েছে শর্টকাট করার। তবে হ্যাঁ, তোর মোস্ট ন্যাচারাল অ্যাকটিং আমাকে খুব বেদনা দিয়েছিল।

আহারে। বললে রবি।

পু-পু ফের মন্তব্য নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিলেন, আমি দক্ষিণ হস্ত শূন্যে তুলে বললাম, তিষ্ঠ ম্যাডাম। আমি চাইছি, কেসটাকে ট্র্যাজেডির দিকে না নিয়ে গিয়ে ইউনিয়নের দিকে নিয়ে যেতে।

হোয়াট ডু ইউ মিন?

কথায় বলে, অল সেপারেশনস এণ্ড ইন ইউনিয়ন। অ্যাণ্ড নাউ আই ওয়ান্ট দেম টু কাম টু এগ্রিমেন্ট।

টু বি রিইউনাইটেড?

টু অ্যাডজাস্ট ডিফারেন্সেস, হারমোনাইজ, অ্যাণ্ড লিভ টুগেদার-না, না, সেই লিভ টুগেদার নয়—টু লিভ অ্যাজ স্বামী অ্যাণ্ড স্ত্রী।

এটা কি একটা মিলন মন্দির।

ধরুন তাই। সব নাটকই যদি মিলনান্ত হয়, তাহলে জীবনটা কত মধুর হয় বলুন তো? আমরা একটা দৃষ্টান্ত রাখতে চাই, এই ডিভোর্স মহামারীর যুগে, ভুল করে

যদি কিছু ভেঙে যায়, ভুল শুধরে নিয়ে তা জুড়ে নেওয়াই ভাল। ভালবাসার মেল্টিং পটে ভাঙা কাচও জুড়ে যায়। বিশেষ করে ওরা যখন এক চৈত্র মাসে একে অপরের চোখে নিজের নিজেদের সর্বনাশ দেখেছিল। প্রকৃত প্রেম তো তাকেই বলে। জ্বালায়, আবার জোড়া লাগায়।

পু-পু পুলিশি চোখে আমাকে জরিপ করতে করতে বললেন, আপনি কি অন্তর্যামী? থট রিডার? এই দুজন-রবি আর কল্পনাকে দেখিয়ে-এই দু'জন যদি এখনও প্রেমাসক্ত থাকেন, তাহলে এই লঙ্কাকাণ্ডটা বাঁধালেন কেন?

আমি টুকুস করে বলে দিলাম—অপরাধ নেবেন না, মেয়েরা একটু দ্রৌপদী-দ্রৌপদী টাইপের হয়—বিশেষ করে এই হাই-টেক যুগে সিলিকন বিউটি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা যখন চরমে উঠে বেশরমে পৌঁছে একটা হিড়িকে পর্যবসিত হয়েছে... ট্রয়য় ধ্বংস হয়ে গেল... লঙ্কাটঙ্কা পুড়ে ছাই হয়ে গেল... কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা... এই দ্রৌপদীর জন্যেই... হয়েছিল বলেই তো আমরা গীতা পেয়েছিলাম। উল্টে নিন গীতা-কে... ত্যাগী। একটু ত্যাগ করলেই সব পাওয়া যায়। বিশেষ করে ছেলের জন্যে সব বাবা, সব মা ত্যাগ করে এসেছেন যুগ যুগ ধরে। নইলে যে ছেলেরা সোশ্যাল প্রব্লেম হয়ে দাঁড়াবে। আমি সোমনাথকে ক্লোজলি ওয়াচ করেছি, ওর মনের নিঃসঙ্গতা আমাকে কষ্ট দিয়েছে। মন্তেসরি। কি বলেননি, প্রথম দু'বছরই শিশুর মস্ত শিক্ষা সমাপ্ত হয়? ছ'বছরে বলতে গেলে জগত দর্শন করা হয়ে যায় মা আর বাবার মধ্যে দিয়ে। আর সোমনাথ? ঠিক ওই ছ'বছর বয়স থেকেই বাবাকে চোখের আড়ালে এনে ফেলল মায়ের চাপে। রবি, তোর বিবেক, তোর জাজমেন্ট, তোর পাওয়ার অফ অবজারভেশন, তোর ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতাতে আমি ঈর্ষা করি। সোমনাথের মুখ চেয়ে তুই কল্পনাকে কাছে টেনে নে। দেবর-বউদি সম্পর্ক থাকুক আমার সঙ্গে কল্পনার। তোরা এক হয়ে গিয়ে হিরে পাণ্ডাদের মেরে ঠাণ্ডা কর।

তাই হয়েছিল। পেশোয়ার থেকে আমদানি হিরে ভর্তি পাথরের ডিম গায়েব করেছিল বটে রবি এজেন্সি মারফত কলকাতার মরুদ্যানে, আমার এজেন্সি মারফতই তুলে দিয়েছিল জনহিতৈষী একটা সংস্থায়।

উপসংহারটা নাতিদীর্ঘ হয়ে গেল। সরি। আমি লেখক নই।

কী বলছেন? কল্পনার সঙ্গে আমার এখনকার সম্পর্কটা কি রকম?

মশায় পাঠক-পাঠিকা, আপনারা বড় বেশি জানতে চান। বড় বেশি কৌতূহলী। এ সব যে আমাদের প্রাইভেট ব্যাপার! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে দেখলেই এখনও কল্পনা তার সবুজ চোখ নাচায়, কথায় জলতরঙ্গ বাজায়, দেহ তরঙ্গে মণিপুরী নৃত্য দেখায়, মুক্তো দাঁতে বিদ্যুৎ ঝলসায়। রবি রে, আমার গ্রেট ফ্রেণ্ড রবি রে, তাই দেখে মুচকি মুচকি হাসে আর বলে, ও তোর বিয়ে দেবেই।

কিন্তু সে গুড়ে বালি!

আবার একটু উপসংহার

বেশ বুঝছি, পাঠক-পাঠিকারা উসখুস করছেন একটা বিষয়ের রহস্য কথা শুনতে। দণ্ডপথ হঠাৎ মারা গেলেন কেন?

মশায় পাঠক-পাঠিকা, মনে করে দেখুন, দণ্ডপথের ব্রহ্মতালুর কাছে নাছি উড়তে দেখা গেছিল। কেন জানেন? সেখানে রক্ত জমেছিল। সেই রক্ত এল কোত্থেকে? মাথায় পেরেক পোঁতা হয়েছিল। পেরেক কে পুঁতেছিল?

আমার কথাটি ফুরোল! ...কি বলছেন? এখনও ফুরোয়নি? কে ঠুকে ঠুকে পুঁতে দিয়েছিল পেরেক? বড় পয়েন্টে প্রশ্ন করেন তো!

হ্যাঁ, কল্পনাই ঠুকে ঠুকে পুঁতে দিয়ে জান কাবার করে দিয়েছিল মহাত্মা। দণ্ডপথের। যাতে অন্য মেয়েগুলো রেহাই পায়। আমি কিন্তু তাই পই পই করে। বলে দিয়েছি রবিকে-খবরদার, কল্পনার সঙ্গে এক শয্যায় আর নয়। এক ঘরেও নয়। তোর ঔরসজাত পুত্রকে মানুষ করার জন্যেই তুই শুধু সঙ্গ দিবি তার গর্ভধারিণীকে—তার বেশি একদম নয়। নো বডি টাচ, নাথিং কিছু। তিব্বতের মন্ত্র দণ্ডপথের মধ্যে দিয়ে তোর কাছে এসে যেন লুপ্ত না হয়ে যায় ছেলেটাকে দিবি যথা সময়ে। সে বড় হোক, তুই এক বাড়িতে থাক—কিন্তু এক ঘরে নিশিযাপন আর নয়—ওই সবুজনয়না ত্রাটকযোগিনী খুনি ব্র্যাণ্ডেড রমণীর সঙ্গে।

কি বলছেন? পাথরের ডিম ছ'খানা কল্পনা ফিরিয়ে দিয়েছিল রবিকে? দিয়েছে... দিয়েছে... দিয়েছে... গুপ্ত সমিতিও ত্যাগ করেছে... ছেলের জন্যে।

আরও প্রশ্ন আছে? নাইজেলের রূপান্তর আমি জানলাম কী করে?

প্রেমচাঁদের দৌলতে। প্রেমচাঁদই আমাকে জানিয়ে রেখেছিল, সোর্স ইনফরমেশন দিয়ে জেনেছিল, সুবুদ্ধি মুসলিমরা সংঘবদ্ধ হয়ে উগ্রতা আর সন্ত্রাস রোধের চেষ্টা চালাচ্ছে। নির্লোম সুফি এই সুবুদ্ধিদের একজন। নির্লোম কুবুদ্ধি নাইজেলকে সে হাড়ে হাড়ে চেনে। টেররিস্টদের হাত কাটা যাবে নাইজেলকে জেলে ঢোকাতে পারলে। সুফি তাই এসেছিল—প্রেমচাঁদের প্ল্যানে।

আপনাদের কৌতূহল এতক্ষণে নিশ্চয় মিটেছে? এবার তাহলে আমার ছুটি।

নমস্কার।